কলেজ বার্ষিকী-২০১৭

উৎকর্ষ সাধনে অদম্য

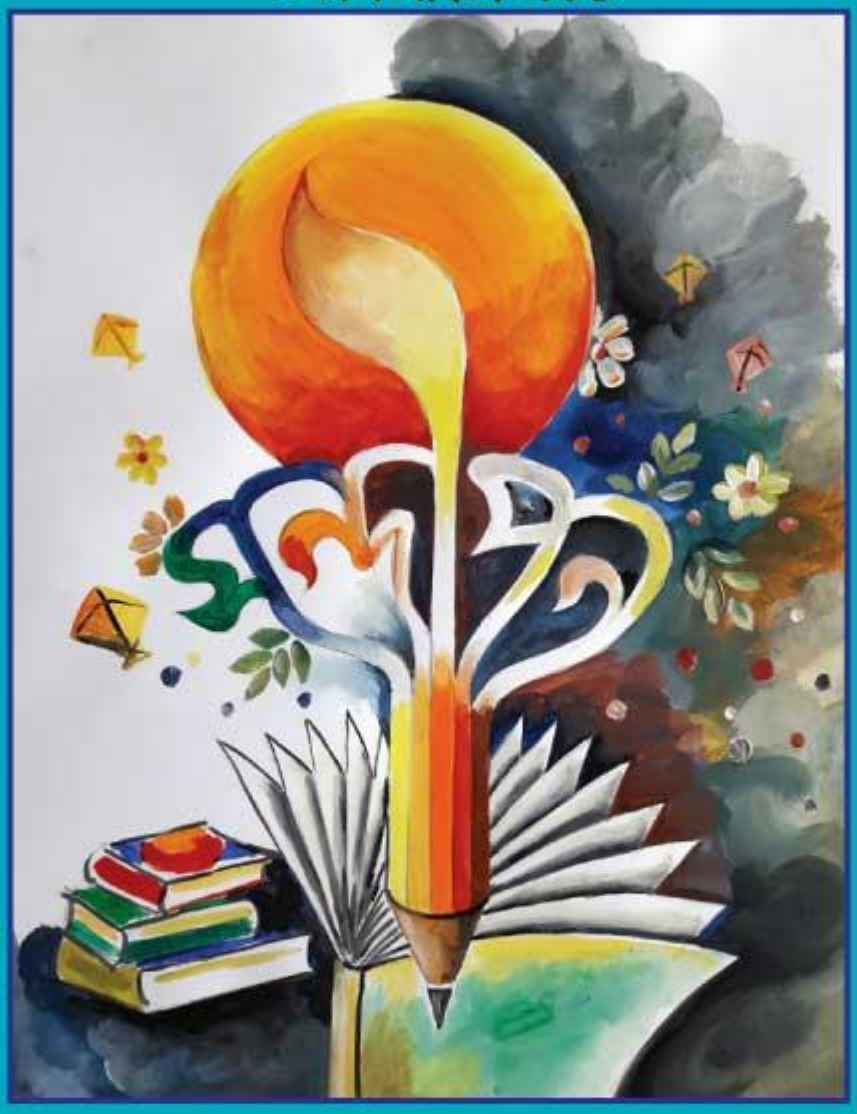

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

স্মরণিকা বার্ষিকী-২০১৭ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

পৃষ্ঠপোষক :

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আবদুল মান্নান ভূঁইয়া
প্রাক্তন অধ্যক্ষ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শেখ শরিফুল ইসলাম, পিএইচ
অধ্যক্ষ

উপদেষ্টামণ্ডলী :

নিশাত হাসান, উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি-সিনিয়র শাখা
মোঃ মনজুরুল হক, উপাধ্যক্ষ, দিবা-সিনিয়র শাখা
ড. মোঃ নূরুন নবী, উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি-জুনিয়র শাখা
আসমা বেগম, উপাধ্যক্ষ, দিবা-জুনিয়র শাখা

বার্ষিকী সম্পাদনাপর্ষদ-২০১৭

মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক
রাশেদ আল মাহমুদ, সহকারী অধ্যাপক
রতন কুমার সরকার, সহকারী অধ্যাপক
ত ম মালেকুল এহতেশাম লালন, সহকারী অধ্যাপক
আসাদুল হক, সহকারী অধ্যাপক
রাসেল আহমেদ, প্রভাষক
তারেক আহমেদ, প্রভাষক
তামান্না আরা, প্রভাষক
মোঃ আবু সাঈদ, প্রভাষক
মাস্টার মাহতাব উদ্দিন অনিক, দ্বাদশ- (প্রভাতি শাখা)
মাস্টার তানজিরুল ইসলাম রাফি, দ্বাদশ- (দিবা শাখা)

মুদ্রণতত্ত্বাবধান : মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক
রাশেদ আল মাহমুদ, সহকারী অধ্যাপক
রতন কুমার সরকার, সহকারী অধ্যাপক
ত ম মালেকুল এহতেশাম লালন, সহকারী অধ্যাপক
আসাদুল হক, সহকারী অধ্যাপক
তারেক আহমেদ, প্রভাষক
তামান্না আরা, প্রভাষক

আলোকচিত্র : আসাদুল হক, সহকারী অধ্যাপক
তারেক আহমেদ, প্রভাষক

প্রচ্ছদ : রতন কুমার সরকার, সহকারী অধ্যাপক

প্রকাশকাল : ০১ মার্চ, ২০১৮

মুদ্রণ : অনিমা
৯৯ ও ২৮৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা
ফোন : ০১৮৭৬-৯৪৭৭৭৮, ০১৯১২-১৬০৪৪৬
ই-মেইল : animacommunications@gmail.com

অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষবৃন্দ, শিক্ষক প্রতিনিধিদ্বয় এবং বার্ষিকী সম্পাদনাপর্ষদ

সভাপতির বাণী

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিকী অনেকটা জানালা স্বরূপ। জানালা দিয়ে যেমন একটি কক্ষের অবস্থা বোঝা যায়, তেমনি বার্ষিকী বুঝিয়ে দেয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, চিন্তা-চেতনা। বার্ষিকীতে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ থাকে বলে তারা সৃজনশীল কাজের প্রতি আগ্রহী ও উৎসাহী হয়ে উঠে। মূলত যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিকী প্রকাশের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এখানেই। সে লক্ষ্যে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে প্রতিবারের মত এবারও বার্ষিকী প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানের এমন উৎসাহমূলক সৃজনশীলতা বিকাশের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

'সন্দীপন-২০১৭' তে যে সব শিক্ষার্থীর লেখা ও ছবি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তাদের জানাচ্ছি উষ্ণ অভিনন্দন। আশা করি এ নবীন লেখকদের মধ্য হতেই ভবিষ্যতে খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটবে। তাদের জন্য রইল আমার শুভকামনা ও আশীর্বাদ।

পরিশেষে, বার্ষিকী প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

সোহরাব ১৮.০২.২০১৮

(মোঃ সোহরাব হোসাইন)
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
সভাপতি
বোর্ড অব গভর্নরস
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

বিদায়ি অধ্যক্ষের বাণী

বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ একটি প্রতিষ্ঠিত নাম। 'উৎকর্ষ সাধনে অদম্য' মূলমন্ত্রে দীক্ষিত এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যেই একাডেমিক ও নানাবিধ সহশিক্ষা কার্যক্রমে তাদের পারঙ্গমতার স্বাক্ষর রেখেছে। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আবারও কলেজ বার্ষিকী 'সন্দীপন' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

সমকালীন প্রেক্ষাপটে আমরা এখন কিছু সংকটময় মুহূর্ত অতিক্রম করছি। সাম্প্রদায়িক উগ্রতা, অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার, আকাশসংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির কূটকৌশলে আমাদের তরুণ সমাজ যখন আজ কিছুটা বিভ্রান্ত তখন আমাদের মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা, দেশপ্রেম এবং নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পৃক্ত সাহিত্যচর্চা এবং সৃজনশীলতা বড় বেশি প্রয়োজন। পড়াশোনার পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধগুলো সমুন্নত রেখে সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী পরিপূর্ণ ও আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। শুধু সর্বোচ্চ 'জিপিএ' প্রাপ্তিই নয় বরং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নিজেকে আলোকিত করে গড়ে তোলাই হোক প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কলেজ বার্ষিকী 'সন্দীপন' শিক্ষার্থীদেরকে সেই শুদ্ধি ও আলোর পথে উদ্দীপিত করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

'সন্দীপন-২০১৭' সংখ্যায় যাঁদের লেখা প্রকাশিত হলো তাঁদেরকে আমার অভিনন্দন। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও নিরন্তর শুভেচ্ছা।

মোঃ আবদুল মান্নান ভূঁইয়া
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
অধ্যক্ষ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

নবাগত অধ্যক্ষের বাণী

মানুষ স্রষ্টার এক অনন্য সৃষ্টি। সে প্রতিনিয়ত প্রকৃতির গতিশীলতা ও সময়ের বিবর্তনের মুখোমুখি হয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তা থেকেই নিজেকে সমৃদ্ধ করে। এই সমৃদ্ধ জ্ঞানকে বিকশিত করতেই সূচনা হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষের ভেতরের সুপ্ত সুকুমার বৃত্তিকে অনুপ্রাণিত করে, আর সুকুমার বৃত্তিকে মানুষ ধরে রাখে তার সৃজনশীল সৃষ্টির মাধ্যমে।

মনুষ্যত্ব অর্জন ও মূল্যবোধ জাগরণে জ্ঞানচর্চার কোনো বিকল্প নেই। এই জ্ঞানচর্চার পূর্ণতা, জাতীয় সংহতি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতাপূর্ণ মূল্যবোধ অর্জনের জন্যই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কলেজ বার্ষিকী একটি ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তাদের মেধা ও মননশীলতা বিকশিত হয়ে মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। কলেজ বার্ষিকীর এই গুরুত্ব স্বীকার করেই ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৭ শিক্ষাবর্ষেও কলেজ বার্ষিকী 'সন্দীপন' প্রকাশ করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পাশাপাশি তাদের সাহিত্য ও শিল্পচর্চা এবং সৃজনশীলতা বিকাশে সহযোগিতা করছে। আমি প্রত্যাশা করি, কলেজ বার্ষিকী 'সন্দীপন-২০১৭' শিক্ষার্থীদের পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে মননশীল সৃষ্টিকর্মে অনুপ্রাণিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষে, কলেজ বার্ষিকী প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত কলাকুশলীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি আশা-করছি অন্যান্য বছরের মতো 'সন্দীপন-২০১৭'ও শৈল্পিক সমৃদ্ধি নিয়ে পাঠকের জ্ঞানালোককে আরো দীপ্তিময় করতে অনন্য ভূমিকা রাখবে।

শেখ শরিফুল ইসলাম, পিএইচডি
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
অধ্যক্ষ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বাংলাদেশের অন্যতম খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। 'উৎকর্ষ সাধনে অদম্য' এই মূলমন্ত্রে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণ একাডেমিক ও সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে সুনাম অর্জনের পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে নিজ নিজ মেধা ও মননশক্তি দিয়ে যথেষ্ট সৃজনশীলতা ও পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কলেজ বার্ষিকী 'সন্দীপন-২০১৭' প্রকাশ হতে যাচ্ছে।

'সন্দীপন-২০১৭' তে রয়েছে তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের লেখা– ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, আত্মকথা, ধাঁধা, কৌতুক, সাধারণজ্ঞান, জানা-অজানা প্রভৃতি। এছাড়াও পরিবেশিত হয়েছে– শিক্ষা-সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম, আন্তঃহাউস এবং আন্তঃস্কুল ও কলেজ প্রতিযোগিতায় সাফল্য, গৌরবময় সুসংবাদ ও সচিত্র বিবরণী। শ্রেণি শিক্ষকসহ শিক্ষার্থীদের গ্রুপ ছবি প্রকাশের মাধ্যমে 'সন্দীপন-২০১৭' পেয়েছে একটি ভিন্নমাত্রা।

শিশু ও কিশোর মনের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মাধ্যম হিসেবে কলেজ বার্ষিকীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কলেজ বার্ষিকী সাহিত্যপ্রতিভা বিকাশের একটি সৃজনশীল মাধ্যম। তাই এ বার্ষিকী হয়ে উঠেছে শিশু-কিশোরদের অনাবিল স্বপ্ন কথার আর গল্পবলার খোলা জানালা। সুকুমারবৃত্তি চর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রাণপ্রাচুর্যে উদ্দীপিত হয়ে ভবিষ্যতে পূর্ণ ও বিকশিত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার লক্ষ্যে নিজেদের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন বিনির্মাণের সুযোগ পাবে; জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও মুক্তচিন্তার অন্বেষায় আগামী দিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশের রূপকল্পকে বাস্তবায়ন করবে। আর সেই সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে দেশ-কালের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বের দরবারে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবে। আমার বিশ্বাস কলেজ বার্ষিকী 'সন্দীপন-২০১৭' শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যথার্থ সৃজনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

শিক্ষকদের বিচিত্র অভিজ্ঞতালব্ধ লেখা সন্দীপনের মানকে করেছে সমৃদ্ধ। তাঁদের জন্য রইল আন্তরিক ধন্যবাদ। এ কলেজের অধ্যক্ষ সন্দীপনের পৃষ্ঠপোষক এবং উপাধ্যক্ষবৃন্দ উপদেষ্টা হিসেবে নানাভাবে তাঁদের সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে এ প্রকাশনা সহজ ও সার্থক করে তুলেছেন। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে 'সন্দীপন-২০১৭' প্রকাশ হতে যাচ্ছে, সেই বার্ষিকী সম্পাদনাপর্ষদসহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, শিক্ষার্থী সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

'সন্দীপন-২০১৭' কে সর্বাঙ্গ সুন্দর করার ক্ষেত্রে আন্তরিক প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও কিছু ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি।

মোঃ রফিকুল ইসলাম
আহ্বায়ক
সন্দীপন সম্পাদনাপর্ষদ-২০১৭
এবং
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

বোর্ড অব গভর্নরস

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সভাপতি

শাহাবুদ্দিন আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব (বাজেট-১), অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সদস্য

মোঃ মুয়াজ্জেম হোসাইন
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সদস্য

প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
প্রাক্তন সদস্য

প্রফেসর মোঃ মাহাবুবুর রহমান
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
সদস্য

দেওয়ান মোহাম্মদ হানজালা
প্রধান প্রকৌশলী
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা
এবং অভিভাবক প্রতিনিধি-প্রভাতি শাখা
সদস্য

মোঃ হাবিবুর রহমান
যুগ্ম-সচিব, পরিচালক (অর্থ), বিএসটিআই,
শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা
এবং অভিভাবক প্রতিনিধি-দিবা শাখা
সদস্য

মোঃ শামসুর রহমান তালুকদার
সহযোগী অধ্যাপক ও শিক্ষক প্রতিনিধি
(প্রভাতি শাখায় কর্মরত)
প্রাক্তন সদস্য

মোঃ বাকাবিল্লাহ
সহকারী অধ্যাপক ও শিক্ষক প্রতিনিধি
(দিবা শাখায় কর্মরত)
প্রাক্তন সদস্য

মোহাম্মদ নুরুন্নবী
সহযোগী অধ্যাপক ও শিক্ষক প্রতিনিধি
(প্রভাতি শাখায় কর্মরত)
নবাগত সদস্য

এ কে এম বদরুল হাসান
প্রভাষক ও শিক্ষক প্রতিনিধি
(দিবা শাখায় কর্মরত)
নবাগত সদস্য

মোঃ আবদুল মান্নান ভূঁইয়া
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

শেখ শরিফুল ইসলাম,
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
অধ্যক্ষ, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
সদস্য-সচিব

শিক্ষকবৃন্দ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ আবদুল মান্নান ভূঁইয়া
বিদায়ি অধ্যক্ষ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
শেখ শরিফুল ইসলাম, পিএইচডি
নবাগত অধ্যক্ষ

উপাধ্যক্ষবৃন্দ

নিশাত হাসান
প্রভাতি-সিনিয়র শাখা

মোঃ মনজুরুল হক
দিবা-সিনিয়র শাখা

ড. মোঃ নূরুন নবী
প্রভাতি-জুনিয়র শাখা

আসমা বেগম
দিবা-জুনিয়র শাখা

সহযোগী অধ্যাপকবৃন্দ

ফাতেমা জোহরা
ইসলামশিক্ষা

মোহাম্মদ শহীদ উল্যাহ
গণিত

রওশন আরা বেগম
ইসলামের ইতিহাস

মোঃ রফিকুল ইসলাম
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মোঃ ফিরোজ খান
পরিসংখ্যান

মোঃ হায়দার আলী প্রামাণিক
বাংলা

মোঃ লোকমান হাকিম
ব্যবস্থাপনা

মোঃ গোলাম মোস্তফা
হিসাববিজ্ঞান

মোঃ শামসুর রহমান তালুকদার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

সাবেরা সুলতানা
ইংরেজি

মোঃ মেসবাউল হক
ইংরেজি

শেখ মোঃ আব্দুল মুগনী
অর্থনীতি

মোহাম্মদ নূরুন্নবী
যুক্তিবিদ্যা

জে এম আরিফুর রহমান
রসায়নবিজ্ঞান

সুদর্শন কুমার সাহা
গণিত

রানী নাছরীন
পদার্থবিজ্ঞান

সহকারী অধ্যাপকবৃন্দ

মোহাম্মদ সুলতান উদ্দিন
শারীরিক শিক্ষা

রাশেদ আল মাহমুদ
ইংরেজি

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
ইংরেজি

মির্জা তানবীরা সুলতানা
চারু ও কারুকলা

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ আল মামুন
পদার্থবিজ্ঞান

মোহাম্মদ আরিফুর রহমান
ইংরেজি

রতন কুমার সরকার
চারু ও কারুকলা

মোঃ বাকাবিল্লাহ
ইতিহাস

অনাদি নাথ মণ্ডল
গণিত

আখতার জাহান ফেরদৌসী বানু
কম্পিউটারশিক্ষা

ত ম মালেকুল এহতেশাম লালন
বাংলা

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
ইসলামশিক্ষা

নাসরীন বানু
উদ্ভিদবিদ্যা

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
গণিত

মোঃ জাহেদুল হক
রসায়নবিজ্ঞান

প্রশান্ত চক্রবর্তী
গণিত

মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
প্রাণিবিদ্যা

আসাদুল হক
ইংরেজি

মুহাঃ ওমর ফারুক
ইসলামশিক্ষা

সামীয়া সুলতানা
অর্থনীতি

মোঃ রফিকুল ইসলাম
গণিত

প্রসনজিত কুমার পাল
রসায়নবিজ্ঞান

মোঃ শাহরিয়ার কবির
বাংলা

মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন মৃধা
ব্যবস্থাপনা

নার্গিস জাহান কনক
উদ্ভিদবিদ্যা

ড. রুমানা আফরোজ
বাংলা

প্রসূন গোস্বামী
ইংরেজি

মোহাম্মদ সেলিম
পদার্থবিজ্ঞান

হাফিজ উদ্দিন সরকার
উদ্ভিদবিদ্যা

জাকিয়া সুলতানা
প্রাণিবিদ্যা

ফাতেমা নুর
ইংরেজি

নুরুন নাহার
চারু ও কারুকলা

মোঃ আয়নুল হক
ইংরেজি

প্রভাষকবৃন্দ
(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

মোঃ ফরহাদ হোসেন
ভূগোল

সাবরিনা শরমিন
ভূগোল

এ কে এম বদরুল হাসান
পদার্থবিজ্ঞান

খন্দকার আজিমুল হক পাপ্পু
পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ ফারুক হোসেন
রসায়নবিজ্ঞান

মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসাইন
পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ হারুনুর রশিদ ভূঁইয়া
রসায়নবিজ্ঞান

মোঃ হাবিবুর রহমান
প্রাণিবিদ্যা

মুহাম্মদ আব্দুলাহ আল-মামুন
ইসলামশিক্ষা

মোঃ নজরুল ইসলাম
রসায়নবিজ্ঞান

অসীম কুমার দাস
ভূগোল

দেওয়ান শামছুদ্দোহা
ইংরেজি

মোঃ শামসুজ্জোহা
শারীরিক শিক্ষা

জি এম এনায়েত আলী
উদ্ভিদবিদ্যা

মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া
পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ নুরুল ইসলাম
কৃষিশিক্ষা

মোঃ আবু তৌহিদ মিয়া
কৃষিশিক্ষা

মোঃ খায়রুল আলম
কৃষিশিক্ষা

মোঃ ফারুক হোসেন
শারীরিক শিক্ষা

মোঃ মহিউদ্দিন
ইসলামশিক্ষা

মুহাম্মদ মনির হোসাইন গাজী
গণিত

হোসেন মুহাম্মদ ফরহাদ উদ্দিন ভূঁইয়া
বাংলা

মোঃ হিসাব আলী
গণিত

মোঃ ওয়াছিউল ইসলাম
গণিত

মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী
বাংলা

মুহসিনা আক্তার
হিসাববিজ্ঞান

জাফর ইকবাল
হিসাববিজ্ঞান

মশিউর রহমান
বাংলা

মোহাম্মদ আল আমিন
ইসলামশিক্ষা

মোঃ এনামুল হক
ইংরেজি

সৈয়দ আহমেদ মজুমদার
ইসলামশিক্ষা

মোসাঃ ইশরাত জাহান
কৃষিশিক্ষা

তৌফাতুন্নাহার
পরিসংখ্যান

রাসেল আহমেদ
কম্পিউটারশিক্ষা

মোঃ আমিনুর রহমান
রসায়নবিজ্ঞান

মোঃ জসিম উদ্দীন বিশ্বাস
ইংরেজি

রাশেদুল মনসুর
ইংরেজি

হাসিনা ইয়াসমিন
ভূগোল

আবদুল কুদ্দুস
যুক্তিবিদ্যা

মোহাম্মদ মাঈনুদ্দীন
ইংরেজি

হরি পদ দেবনাথ
রসায়নবিজ্ঞান

নিয়ামত উল্লাহ
পদার্থবিজ্ঞান

রফিকুল ইসলাম
পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ নাহিদুল ইসলাম
পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ আবু ছালেক
উদ্ভিদবিদ্যা

তানিয়া বিলকিস শাওন
বাংলা

আয়িশা আনোয়ার
কম্পিউটারশিক্ষা

মোঃ আব্দুল জলিল
ইংরেজি

মোঃ আশিক ইকবাল
কম্পিউটারশিক্ষা

মোঃ মাসুম বিন ওহাব
রসায়নবিজ্ঞান

মোঃ খলিল মিয়া পাঠান
রসায়নবিজ্ঞান

ওমর ফারুক
গণিত

মোঃ হাসান মাহমুদ আবু বক্কর সিদ্দিক
গণিত

মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম
প্রাণিবিদ্যা

মোঃ আবু সালেহ
গণিত

ফাহমিদা আক্তার
বাংলা

তারেক আহমেদ
বাংলা

মোঃ খায়রুজ্জামান
ইংরেজি

তামান্না আরা
বাংলা

আয়েশা খাতুন
প্রাণিবিদ্যা

মো. আমিনুল ইসলাম
বাংলা

মোঃ আবু সাঈদ
ইংরেজি

মোঃ আহসানুল হক
ব্যবস্থাপনা

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
ইসলামশিক্ষা

মোঃ মাজহারুল হক
ইতিহাস

মোঃ মুরাদুজ্জামান আকন্দ
অর্থনীতি

মোঃ জাকারিয়া আলম
ইংরেজি

মু. ওমর ফারুক
পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ আব্দুল হামিদ
ইসলামশিক্ষা

মোঃ ওয়াজিব উল্লাহ্
উদ্ভিদবিদ্যা

ফারজানা ইসলাম
বাংলা

মোঃ সাদিউল ইসলাম
ইংরেজি

মোঃ শফিকুল ইসলাম
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মোহাম্মদ ছায়েদুর রহমান
গণিত

মোঃ সোলাইমান আলী
ইংরেজি

মোঃ সাইফুল ইসলাম
গণিত

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
ইতিহাস

মোঃ মুজাহিদ আতীক
বাংলা

লুৎফুন নাহার
প্রাণিবিদ্যা

মোঃ তরিকুল ইসলাম
বাংলা

নিসাত নওশিন
বাংলা

আছমা খাতুন
বাংলা

মোঃ মাইদুল ইসলাম
বাংলা

আফসানা আক্তার
বাংলা

মোঃ রাজিব শেখ
গণিত

দুলাল চন্দ্র দাস
গণিত

মোঃ আফজাল হোসেন
ইংরেজি

মোঃ হাফিজুর রহমান
ইংরেজি

মোঃ রাফসানুর রহমান
ইংরেজি

সহকারী শিক্ষকবৃন্দ

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক, ইসলামশিক্ষা

ভারত চন্দ্র গৌড়
সহকারী শিক্ষক, ক্রীড়া

মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন
সহকারী শিক্ষক, ক্রীড়া

প্রণব হাওলাদার
সহকারী শিক্ষক, হিন্দুধর্ম

বর্নালী ঘোষ
সহকারী শিক্ষক, সঙ্গীত

প্রদর্শকবৃন্দ

আব্দুল মোমেন খান
প্রদর্শক, ভূগোল

মোঃ ছানাউল হক
প্রদর্শক, জীববিজ্ঞান

মোঃ কামাল হোসেন
প্রদর্শক, কম্পিউটারশিক্ষা

সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী
প্রদর্শক, কম্পিউটারশিক্ষা

মোঃ ফোরকান
প্রদর্শক, রসায়নবিজ্ঞান

তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ

সৈয়দ শাকির আহমেদ
সুপারিন্টেনডেন্ট

আব্দুল্লাহ মুর্শিদ
হিসাব রক্ষক

মোসাম্মৎ তহমিনা খানম
প্রধান সহকারী

আব্দুর রহিম
উচ্চমান সহকারী

মোঃ ইফতিয়ার হোসেন তালুকদার
উচ্চমান সহকারী

ফারহানা আফরোজ
উচ্চমান সহকারী

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
উচ্চমান সহকারী

রওশন আরা সাথী
মেট্রন

মুন্নিরা বেগম
মেট্রন

মোঃ রবিউল ইসলাম
ফার্মাসিস্ট

চন্দন কুমার সরকার
ফার্মাসিস্ট

মোহাম্মদ সুহেল রানা
স্টোরকিপার

মোহাম্মদ আফজাল হোসেন
স্টোরকিপার

মোঃ খাইরুল ইসলাম
একাউন্টস্ এ্যাসিস্টেন্ট

মুহাম্মদ শহিদুর রহমান
অফিস সহকারী

মোহাম্মদ লোকমান হোসেন
স্টুয়ার্ড

মোছাঃ রোকেয়া আখতার
অফিস সহ. কাম কম্পিউটার অপারেটর

দিলীপ কুমার পাল
স্টুয়ার্ড

হাবিবুর রহমান
একাউন্টস্ এ্যাসিস্টেন্ট

মোঃ শহীদুল ইসলাম
একাউন্টস্ এ্যাসিস্টেন্ট

রিপন মিয়া
হিসাব সহকারী

মোঃ মঈনুল হাসান
এ্যাডিশনাল সুপারিনটেনডেন্ট

হাসিনা খাতুন
অফিস সহকারী

আল-মামুন
অফিস সহকারী

তানজিম হাসান
স্টুয়ার্ড

মোঃ মঞ্জুরুল হক
স্টুয়ার্ড

মোহাম্মদ লিটন মিয়া
স্টোর অ্যাসিস্টেন্ট

মোঃ আব্দুল খালেক
ড্রাইভার

মোঃ শহীদউল্লাহ
ড্রাইভার

চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ

মোঃ ফরহাদ উদ্দিন মজুমদার
ইলেকট্রিশিয়ান

মোঃ চাঁদ মিয়া
প্লাম্বার

মোঃ ছাদেক আলী
কার্পেন্টার (কাঠমিস্ত্রী)

মোঃ ছাবেদ আলী
পেইন্টার (রংমিস্ত্রী)

মোঃ ইয়ার আলী
বাবুর্চি

মোঃ আব্দুর রশিদ	মোঃ আব্দুল জলিল	মোঃ মোস্তফা	মোঃ কামাল হোসেন	মোঃ রেজাউল আলম খান	নাসির উদ্দিন আহমেদ	ওসমান আলী
বাবুর্চি	বাবুর্চি	বাবুর্চি	বাবুর্চি	মেশন (রাজমিস্ত্রী)	ওয়ার্ডম্যান	ওয়ার্ডম্যান

মোঃ মফিজুল ইসলাম	নূর মোহাম্মদ কাজল	মোঃ রফিকুল ইসলাম	তপন কুমার পাল	মোঃ আব্দুল মান্নান সিকদার	মোঃ জিন্নাহ	মোঃ দারুল মিয়া
ওয়ার্ডম্যান	সহকারী ইলেকট্রিশিয়ান	পাম্প অপারেটর	পাম্প অপারেটর	প্লাম্বার হেল্পার	কার্পেন্টার (কাঠমিস্ত্রী) হেলপার	পেইন্টার (রংমিস্ত্রি) হেলপার

মোঃ সোহরাব আলী	সাথিয়া	মোঃ হারুন অর রশীদ	মোঃ জাকির হোসেন	মেথিউ রবীন্দ্র মুহুরী	মোঃ খলিলুর রহমান	মোঃ ফারুক ইসলাম হাওলাদার
মেশন (রাজমিস্ত্রী) হেলপার	হেড সুইপার	ল্যাব. অ্যাটেনডেন্ট	ল্যাব. অ্যাটেনডেন্ট	ল্যাব. অ্যাটেনডেন্ট	ল্যাব. অ্যাটেনডেন্ট	ল্যাব. অ্যাটেনডেন্ট

মোঃ আইয়ুব আলী	মোঃ সোহাগ মিয়া	মোঃ মনির হোসেন	মোঃ মোস্তফা	মোঃ নুরুল ইসলাম	মোঃ আবজাল হোসেন	মোঃ আব্বাস আলী
ল্যাব. অ্যাটেনডেন্ট	ল্যাব. অ্যাটেনডেন্ট	হেড মালি	হেড গার্ড	সহকারী বাবুর্চি	সহকারী বাবুর্চি	সহকারী বাবুর্চি

মোঃ সোহরাব হোসেন	মোঃ জাকির হোসেন মনু	মোঃ শহীদুল ইসলাম	মোঃ বদিউর রহমান	মোঃ নূরে আলম সিকদার	মোঃ মহিরুল হক	সাইফুল ইসলাম
সহকারী বাবুর্চি	সহকারী বাবুর্চি	মেট	মেট	মেট	মেট	মেট

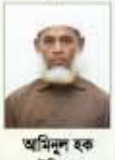

মোঃ আমজাদ হোসেন	মোঃ শাহজাহান প্রধানিয়া	আমিনুল হক	মোঃ সেলিম	মোঃ আমিনুল ইসলাম	গাজী মোস্তফা কামাল	মোঃ মোকছেদুল হক
টেবিলবয়	টেবিলবয়	টেবিলবয়	টেবিলবয়	টেবিলবয়	টেবিলবয়	টেবিলবয়

মোঃ আব্দুল বাছেদ	মোঃ আব্দুল্লাহ	আকিবুল ইসলাম	মোঃ মাইনুর রহমান মাসুম	সেলিম মিয়া	মোঃ রাসেল	মোঃ শহিদুল ইসলাম
টেবিলবয়	টেবিলবয়	টেবিলবয়	টেবিলবয়	টেবিলবয়	টেবিলবয়	টেবিলবয়

মোঃ জাকির হোসেন — ওয়ার্ডবয়
মোহাম্মদ শফিকুর রহমান — ওয়ার্ডবয়
মোহাম্মদ আলাউদ্দিন — ওয়ার্ডবয়
মোহাম্মদ শাহ আজিজুল হক — ওয়ার্ডবয়
মোঃ মজিবুর রহমান — ওয়ার্ডবয়
মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন — ওয়ার্ডবয়
মোঃ আল-আমিন খোন্দকার — ওয়ার্ডবয়

মোঃ সাহাদাত হোসেন — ওয়ার্ডবয়
আবদুল জলিল মিয়া — ওয়ার্ডবয়
আব্দুস সালাম মিয়া — নার্সিং এ্যাসিসটেন্ট
মোঃ ইউনুস — লাইব্রেরি অ্যাটেনডেন্ট
মোঃ আবু সায়েদ — লাইব্রেরি এটেনডেন্ট
মোঃ আহসানুল হক — টেক্সটবুক বেয়ারার
মোঃ আবুল কালাম — এম এল এস এস

মোহাম্মদ আলী খান — এম এল এস এস
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম — এম এল এস এস
মোঃ আবদুর রশিদ — এম এল এস এস
মোঃ দেলোয়ার হোসেন — এম এল এস এস
মোঃ আব্দুর রশিদ শেখ — এম এল এস এস
মোঃ আব্দুল কাদের — এম এল এস এস
মোঃ খালেদ পারভেজ — এম এল এস এস

মোঃ হেমায়েত হোসেন — এম এল এস এস
রাহাত আহমেদ — এম এল এস এস
মোঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন — এম এল এস এস
মোঃ জাকিরুল ইসলাম — এম এল এস এস
মোঃ মোকলেছুর রহমান — স্টোর অর্ডারলি
মোঃ মন্টু মোল্লা — মালি
মুকুল — মালি

মোঃ রাহাত খান — মালি
মোঃ আবু সাঈদ মোল্লা — হাউসমালি
মোঃ শহীদুল ইসলাম — হাউসমালি
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক খাঁন — হাউসমালি
মোঃ নাছির উদ্দিন — হাউসমালি
মোঃ লাভলু মিয়া — হাউসমালি
মোঃ ইমদাদুল হক — হাউসমালি

মোঃ আজমল হোসেন — গ্রাউন্ডসম্যান
মোঃ শহিদুল ইসলাম — গ্রাউন্ডসম্যান
মোঃ জাহিরুল ইসলাম — গ্রাউন্ডসম্যান
মোঃ সাইফুল ইসলাম — গ্রাউন্ডসম্যান
মুহাম্মদ শরীফ হোসেন — গ্রাউন্ডসম্যান
মোঃ হানিফ — গ্রাউন্ডসম্যান
মোঃ নজরুল ইসলাম — নাইট গার্ড

মোঃ কুদ্দুস মোল্লা — নাইট গার্ড
মোঃ আনোয়ারুল হক — নাইট গার্ড
মোঃ মোকছেদ আলী খাঁন — নাইট গার্ড
মোঃ কামাল হোসেন — নাইট গার্ড
মোঃ ফারুক সিকদার — নাইট গার্ড
মোঃ জহুরুল ইসলাম শেখ — নাইট গার্ড
মোঃ জালাল উদ্দিন — নাইট গার্ড

আনোয়ার হোসেন খাঁন
নাইট গার্ড

মোঃ নবীজুল ইসলাম
নাইট গার্ড

মোঃ রাসেল আলী
নাইট গার্ড

মোঃ খলিলুর রহমান
নাইট গার্ড

মোঃ আব্দুল হালিম রেজা
নাইট গার্ড

মোঃ রেজাউল ইসলাম
গেইট দারোয়ান

মোহাম্মদ মজিবুর রহমান
গেইট দারোয়ান

হাফিজ মোল্লা
গেইট দারোয়ান

আবু ছাহিদ দিপু
গেইট দারোয়ান

মোঃ আছাদুজ্জামান হাওলাদার
হাউস গার্ড

মোঃ অবদুল হক
হাউস গার্ড

মোঃ আব্দুর রহমান
হাউস গার্ড

মোঃ শহিদুজ্জামান
হাউস গার্ড

মোঃ রাসেল বেপারী
হাউস গার্ড

মোসাম্মৎ লাইলী আক্তার
সুইপার

আকলিমা বেগম
সুইপার

শ্রী কৃষান দাস
সুইপার

তিমথী পেলোপেল্লী সবুজ
সুইপার

সুজন কুমার পাল
সুইপার

মোঃ হাজারুল ইসলাম
সুইপার

ইমতিয়াজ হোসেন বাবু
সুইপার

মোছাঃ শিউলী আক্তার
সুইপার

এ জেড এম মইনুল আকবর
সুইপার

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সুইপার

মোঃ রিপন শেখ
সুইপার

মোঃ হানিফ
সুইপার

মোঃ স্বপন হোসেন
সুইপার

মোঃ রিপন আলী
সুইপার

পি, জেমস লুক
সুইপার

কৃষ্ণ বাবু
সুইপার

মোসাম্মাৎ জরিনা খাতুন
আয়া

সূচিপত্র

বিষয় শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১. হাউস প্রতিবেদন	২৪-২৯
২. টিচার্স কর্নার	৩১-৩৬
৩. স্টুডেন্টস কর্নার	৩৭-৯৪
৪. চিত্রশৈলী	৯৫-৯৯
৫. স্টুডেন্টস গ্যালারি	১০০-১৪৩
৬. স্মৃতিময় বর্ণিল-২০১৭	১৪৪-১৫২

কুদরত-ই-খুদা হাউস

হাউস মাস্টার
নুরুন্নাহার

হাউস টিউটর
মুহসিনা আক্তার

হাউস এন্ডার
মো. আরেফিন ফাহিম

হাউস প্রিফেক্ট
মো. আব্দুল্লাহ আল মঈন

'উৎকর্ষ সাধনে অদম্য' এই মূলমন্ত্রে সংকল্পবদ্ধ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান– ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি হাউসের মধ্যে অন্যতম ড. কুদরত-ই-খুদা হাউস। ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে স্থাপিত এই হাউসের প্রথম নাম ছিল 'জিন্নাহ হাউস'। স্বাধীনতার পর হাউসটির নামকরণ করা হয় '১ নম্বর হাউস' এবং পরবর্তীকালে প্রতিভাবান বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কুদরত-ই-খুদার নামে নামকরণ করা হয় হাউসটির। নানা ইতিহাস-ঐতিহ্যসহ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের স্বর্ণালি স্মৃতি ধারণ করে সকলের প্রতি এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই হাউসটি। প্রকৃতি পরিবেষ্টিত বর্গাকৃতির দ্বিতল এই হাউসটির সুপরিসর অবকাঠামো দৃষ্টিনন্দন। হাউসটির ঠিক মাঝখানে রয়েছে পুষ্পশোভিত মনোরম ফুলের বাগান এবং হাউসের পেছনে রয়েছে একটি পেয়ারা বাগান। দেয়ালে শোভাবর্ধন করছে ড. কুদরত-ই-খুদার সুদৃশ্য ম্যুরাল। শৃঙ্খলা ও সহমর্মিতার এক অপরূপ সমন্বয় কুদরত-ই-খুদা হাউসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। হাউস পরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন 'হাউস মাস্টার' ও একজন 'হাউস টিউটর'। এ ছাড়া তাদের সহযোগিতার জন্য রয়েছে একজন মেট্রনসহ ১১ জন স্টাফ। তারা সার্বক্ষণিক নিরলসভাবে হাউসের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, সংস্কৃতিবোধ, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিকশিত করার জন্য হাউসে রয়েছে ১০ জন ছাত্রের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। লেখাপড়া ও সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে কুদরত-ই-খুদা হাউসের ছাত্রদের সফলতার রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এ হাউসের সকল ছাত্র এবং জেএসসি পরীক্ষায় এই হাউসের সকল ছাত্রই জিপিএ-৫ পেয়েছে। এ ছাড়া কলেজের আন্তঃহাউস বানান প্রতিযোগিতা ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় এ হাউসের ছাত্ররা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ হাউস ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন ২০১৬ সালে রানার আপ ও ২০১৭ সালে পুনরায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে এবং বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় টানা সপ্তমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আন্তঃহাউস ফুটবল টুর্নামেন্টে পর পর ১০ বার ও আন্তঃহাউস ক্রিকেট টুর্নামেন্টে পর পর ৩ বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

কুদরত-ই-খুদা হাউসের এ কৃতিত্ব ও গৌরব চির অম্লান হয়ে থাকুক এটাই প্রত্যাশা। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হউন।

জয়নুল আবেদিন হাউস

হাউস মাস্টার
মোহাম্মদ আরিফুর রহমান

হাউস টিউটর
নার্গিস জাহান কনক

হাউস এল্ডার
মুস্তফা মুশফিক

হাউস প্রিফেক্ট
রাশেদ সরদার

১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ হলো 'উৎকর্ষ সাধনে অদম্য' এই মূলমন্ত্রে সংকল্পবদ্ধ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের ছয়টি হাউসের মধ্যে অন্যতম হলো জয়নুল আবেদিন হাউস। ১৯৬১ সালের ১মে 'আইয়ুব হাউস' নামে এ হাউসটির যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতার পর দেশ মাতৃকার অমর সন্তান, বাংলাদেশের মহান চিত্রশিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নামানুসারে এ হাউসটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'জয়নুল আবেদিন হাউস'।

হাউসটির অবকাঠামো অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও মনোরম। লাল সিরামিক ইটের তৈরি দোতলা এ হাউসটির সবুজ-শ্যামল পরিবেশ সবাইকে মুগ্ধ করে। হাউসটির দেয়ালের শোভাবর্ধন করছে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের এক সম্প্রতিভ ম্যুরাল। হাউসটির অভ্যন্তরে রয়েছে বর্ণাঢ্যতির একটি অপরূপ মোহনীয় বাগান। বর্তমানে হাউসটিতে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে আটটি বড় কক্ষ এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক চারটি বিশেষ কক্ষ। এ ছাড়া এ হাউসে রয়েছে বিশাল আকৃতির একটি ডাইনিং হল, টিভি ও ইনডোর গেমসের সুবিধাসমৃদ্ধ একটি কমনরুম এবং প্রার্থনার জন্য একটি প্রেয়ার রুম। এ হাউসে বর্তমানে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্ররা বসবাস করছে। ছাত্রদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের জন্য হাউসের সাথেই রয়েছে ১০ জন সার্বক্ষণিক কর্মচারী এবং একজন মেট্রন।

শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্যের এক অনুপম সমন্বয় জয়নুল আবেদিন হাউসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভোরবেলায় পিটি থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছাত্ররা প্রতিটি কাজই রুটিনমাফিক করে। এর মধ্যে তাদের পড়াশুনার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করা হয় সর্বাগ্রে। তাই এ হাউসের ছাত্ররা বরাবরই প্রশংসনীয় ফলাফল অর্জন করে থাকে। ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালের PEC ও JSC পরীক্ষায় এই হাউসের সকল শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ অর্জন করেছে।

সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে এ হাউসের ছাত্রদের সাফল্য ঈর্ষণীয়। ২০১৬ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় 'জয়নুল আবেদিন হাউস' চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ সালের আন্তঃহাউস দেয়াল পত্রিকা ও বাগান প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় 'জয়নুল আবেদিন' হাউস। ২০১৭ সালের আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় এ হাউসটি। এ ছাড়া জুনিয়র শাখায় সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ভলিবল এবং ইনডোর গেমসের চ্যাম্পিয়ন যথারীতি 'জয়নুল আবেদিন হাউস'।

ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করার লক্ষ্যে হাউসে রয়েছে প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। এ হাউসে প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে যেমন রয়েছে গভীর হৃদ্যতা, তেমনি রয়েছে ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সুনিবিড় সম্পর্ক। ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য এ হাউসের কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা, এ হাউসের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক এবং জয়নুল আবেদিন হাউসের এ কৃতিত্ব ও গৌরব চির অম্লান থাকুক।

"কর্মভার নব প্রভাতে নব সেবকের হাতে করে যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাব ঘোষণা করে তোমার আহ্বান।"

ফজলুল হক হাউস

হাউস মাস্টার
মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

হাউস টিউটর
মুহাম্মদ মনির হোসাইন গাজী

হাউস এন্ডার
শাহ্ মো. আশিকুর রহমান

হাউস প্রিফেক্ট
মো. তানবীর রনি

'উৎকর্ষ সাধনে অদম্য' এই মূলমন্ত্রে সংকল্পবদ্ধ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি হাউসের মধ্যে অন্যতম হাউস ফজলুল হক হাউস। দেশমাতৃকার অমর সন্তান কৃষকবন্ধু, অসাধারণ বাগ্মী শেরেবাংলা একে ফজলুল হকের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত এ হাউসের প্রতিটি কাজে তাঁর দেশপ্রেম ও সুমহান আদর্শের অনিন্দ্য প্রকাশ ঘটে। শৃঙ্খলা, নৈপুণ্য ও ঐতিহ্যে সমুজ্জ্বল ফজলুল হক হাউসে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ছোট-বড় ২৮টি রুম, একটি কমনরুম ও সুবিশাল ডাইনিং হল। হাউস পরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। এ ছাড়া তাদের সহযোগিতার জন্য রয়েছেন একজন করে স্টুয়ার্ড, ওয়ার্ডবয়, টেবিলবয়, দারোয়ান, মালি ও বাবুর্চিসহ মোট ১০ জন কর্মচারী। হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে এবং ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের জন্য রয়েছে একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। 'ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ'– এ সংস্কৃত শ্লোকে হাউসের ছাত্ররা মনেপ্রাণে বিশ্বাসী। তাই কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষায় এ হাউসের অধিকাংশ ছাত্রই জিপিএ-৫ অর্জন করে থাকে।

ভোরবেলায় পিটি থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছাত্ররা প্রতিটি কাজই রুটিনমাফিক করে। এর মধ্যে তাদের পড়াশুনার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করা হয় সর্বাগ্রে। ২০১৭ সালের আন্তঃহাউস দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায় এ হাউস রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

সকলের সার্বিক সহযোগিতায় সর্বক্ষেত্রে এ হাউসের সাফল্য ঈর্ষণীয়। ফজলুল হক হাউসের এ কৃতিত্ব ও গৌরব চির অম্লান থাকুক– এটাই প্রত্যাশা। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হউন।

নজরুল ইসলাম হাউস

হাউস মাস্টার
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

হাউস টিউটর
মো. আবু ছালেক

হাউস এন্ডার
মীর আরাফাত বিন রেজা

হাউস প্রিফেক্ট
মো. ফারহান তানভীর

১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ একটি বিশেষায়িত আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যেখানে আবাসিক ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠানের ছয়টি হাউসের মধ্যে জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের নামানুসারে রয়েছে নজরুল ইসলাম হাউস। এ হাউসে বর্তমানে নবম-দ্বাদশ শ্রেণির ছেলেরা বসবাস করছে। এ হাউসে রয়েছে বিশাল আকৃতির একটি ডাইনিং হল, টিভি এবং ইনডোর গেমসের সুবিধাসমৃদ্ধ একটি কমন রুম, প্রার্থনার জন্য একটি প্রেয়ার রুম, ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে বিভিন্ন নামের কক্ষ। হাউসটির ঠিক মধ্যখানে রয়েছে একটি পুষ্পশোভিত মনোরম ফুলের বাগান। হাউসের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। তাঁদের সহায়তার জন্য রয়েছে একজন স্টুয়ার্ড, ওয়ার্ডবয়, টেবিলবয়, দারোয়ান, মালি ও বাবুর্চিসহ মোট ১০ জন কর্মচারী। ছাত্রদের নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ও হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে রয়েছে ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। এ হাউসে প্রত্যেক ছাত্রদের মধ্যে যেমন রয়েছে গভীর হৃদ্যতা, তেমনি ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষক, প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে সুনিবিড় সম্পর্ক। বিদ্রোহী কবির আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হাউসের ছাত্ররা ভোরবেলা পিটি থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি কাজই রুটিন মাফিক করে। এর মধ্যে তাদের পড়াশোনার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করা হয় সর্বাগ্রে। ২০১৭ সালে আন্তঃহাউস ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রানার্সআপ, বাগান প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন আন্তঃহাউস সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, দেয়াল পত্রিকায় চ্যাম্পিয়ন, আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতায় রানার্সআপ হয়। উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পুত্র শহীদ শেখ জামাল এ কলেজের ছাত্র থাকাকালে নজরুল ইসলাম হাউসে আবাসিক ছাত্র ছিলেন এবং এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ২০১০ সালে কলেজের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্নেহভাজন ছোট ভাইয়ের স্মৃতিবিজড়িত এ হাউস পরিদর্শনে আসেন এবং হাউসের চমৎকার পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হন।

লালন শাহ হাউস

হাউস মাস্টার
মোহাম্মদ নূরন্নবী

হাউস টিউটর
মো. খলিল মিয়া পাঠান

হাউস এন্ডার
মো. ফাহিম উদ্দিন

হাউস প্রিফেক্ট
নাজমুস সাকিব

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি হাউসের মধ্যে লালন শাহ হাউস অন্যতম। ১৯৬০ সালে কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এ হাউসের ভবনটি কলেজের 'মেডিকেল সেন্টার' হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ১৯৭৭ সালে তা আবাসিক ছাত্রাবাস হিসেবে শুভযাত্রা শুরু করে। শুরুতে এটি '৩নং হাউস' নামে পরিচিত থাকলেও ১৯৭৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তদানীন্তন অধ্যক্ষ মরহুম কর্নেল জিয়াউদ্দিন আহমেদ বিখ্যাত বাউল সাধক লালন শাহের নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করেন 'লালন শাহ হাউস'।

পূর্ব ও পশ্চিমে প্রলম্বিত ও প্রকৃতি পরিবেষ্টিত দ্বিতল লালন শাহ হাউসের সুপরিসর অবকাঠামো দৃষ্টিনন্দন। শিক্ষা ভবন-১ ও অধ্যক্ষের বাসভবনের সন্নিকটে অবস্থিত ও হাউসে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ২৯টি কক্ষ। এসব কক্ষে ১১০ জন ছাত্রের থাকার সুব্যবস্থা রয়েছে। অত্যন্ত মনোরম ও শিক্ষাসহায়ক পরিবেশে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ররা নিজ গৃহের মতোই অবস্থান করে এ হাউসে। ছাত্রদের অবস্থানের কক্ষ ছাড়াও এ হাউসে রয়েছে অফিস কক্ষ, কমনরুম, ডাইনিং হল, কিচেন, স্টোর ও স্টাফ রুম। হাউসের ছাত্রদের তত্ত্বাবধানের জন্য রয়েছে একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। তাদের সহায়তায় রয়েছে একজন স্টুয়ার্ড, একজন ওয়ার্ডবয়, একজন বাবুর্চি, একজন সহকারী বাবুর্চি, একজন ম্যাট, দুজন টেবিলবয়, একজন মালি, একজন দারোয়ান ও একজন সুইপার। এ হাউসে প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে যেমন রয়েছে হৃদ্যতা, তেমনি ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে সুনিবিড় সম্পর্ক। কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষায় এ হাউসের অধিকাংশ ছাত্রই জিপিএ-৫ অর্জন করে থাকে। লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডেও লালন শাহ হাউসের ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সাফল্য ঈর্ষণীয়। আন্তঃহাউস বাগান ও পুষ্প প্রদর্শনী ও আন্তঃহাউস টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ২০১৭ সালে এ হাউস রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে এবং সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা, আন্তঃহাউস আজান ও ক্বিরাত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস

হাউস মাস্টার
সুদর্শন কুমার সাহা

হাউস টিউটর
মো. খায়রুল আলম

হাউস এন্ডার
সামসুদ্দোহা ইমন

হাউস প্রিফেক্ট
তানজিরুল ইসলাম রাফি

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি হাউসের মধ্যে অন্যতম। বিশিষ্ট ভাষাবিদ জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠার দিক থেকে হাউসটি নবীন। দিবা শাখার ছাত্রদের আবাসন সমস্যা নিরসনে ২০মার্চ ২০০৮ সাল থেকে এ হাউসের যাত্রা শুরু হয়। এ হাউসের আসন সংখ্যা ৮৮টি। এ হাউসের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। তাদের সহায়তার জন্য রয়েছেন একজন স্টুয়ার্ড, একজন বাবুর্চি, একজন সহকারী বাবুর্চি, একজন ম্যাট, দুজন টেবিলবয়, একজন দারোয়ান, একজন মালি ও একজন সুইপার। ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য হাউস কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে এবং ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করার লক্ষ্যে হাউসে রয়েছে একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। হাউসের সামনে রয়েছে সুদৃশ্য ফুলের বাগান ও একটি সুবিশাল মাঠ। পশ্চিমে একটা আমবাগান ও পেয়ারা বাগান। পূর্বে ফুলবাগান এবং পেছনে রয়েছে আরেকটি পেয়ারা বাগান। সবুজে ঘেরা এ হাউসের দিকে তাকালে মন জুড়িয়ে যায় ও শান্তির আশ্বাস মেলে। পাঁচতলা এ হাউসের বিভিন্ন তলায় রঙিন আলো হাউসের সৌন্দর্যকে আরো বৃদ্ধি করেছে। এ মনোরম পরিবেশ ছাত্রদের লেখাপড়ায় মনোযোগ আরো বৃদ্ধি করে। শৃঙ্খলা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় এ হাউসের ছাত্রদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এ হাউসের ছাত্ররা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়ে মা-মাটি-মানুষের ভালোবাসা ও ভক্তির অনুশীলনে অঙ্গীকারবদ্ধ।

২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত আন্তঃহাউস দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায় এ হাউস পর পর পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ ছাড়া ২০১৪ সালে আন্তঃহাউস বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় এবং ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এবং ২০১৭ সালে ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৫ সালে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রানারআপ ও ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৬ ও ২০১৭ সালের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় এ হাউস রানারআপ হয়। এভাবে এ হাউসের ছাত্ররা লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও নানা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা প্রমাণ করে আসছে।

শিক্ষা, সহপাঠ্যক্রমিক শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

সাবেরা সুলতানা
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

কলেজ পরিচিতি

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ একটি ব্যতিক্রমধর্মী স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৬০ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পাবলিক স্কুলের আদলে ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায় ৫২ একর জমির উপর 'রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল' (পরবর্তীকালে 'ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ') প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৬০ সালের ০৬ মে তৎকালীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব হাবিবুর রহমান প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সরাসরি পরিচালিত হলেও ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত করে। ১৯৬৫ সালে প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপান্তরিত করত প্রাদেশিক সরকারের মুখ্য সচিবকে চেয়ারম্যান করে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড অব গভর্নরস এর হাতে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনাভার অর্পণ করে। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় বিদ্যালয়টির নিয়ন্ত্রণক্ষমতা গ্রহণ করে এবং এর স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা বহাল রাখে। ১৯৬৭ সালের ০৯ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটিকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা সচিবকে পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করত প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড অব গভর্নরস গঠন করে। অদ্যাবধি উক্ত বোর্ড অব গভর্নরসই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। সরকারের শিক্ষাসম্প্রসারণ নীতির আওতায় ১৯৯৩ সালে এ প্রতিষ্ঠানে 'দ্বিতীয় শিফট' চালু করা হয়। বর্তমানে উভয় শিফটে তৃতীয় হতে দ্বাদশ শ্রেণিতে বাংলা মাধ্যম ও ইংলিশ ভার্সনে প্রায় ৫০০০ জন ছাত্র আবাসিক/অনাবাসিক হিসেবে অধ্যয়ন করছে।

যুগোপযোগী শিক্ষা ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক/মানসিক ও নৈতিক গুণাবলির সুষম বিকাশ সাধন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বৃহত্তর কর্মজীবন ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষা ও সহপাঠ্যক্রমিক ক্ষেত্রে সাফল্য এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের চিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্রদের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল বরাবরই উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্ররা শতকরা প্রায় একশত ভাগ পাশ করে থাকে। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রদের সংখ্যাই বেশি। এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র বোর্ডবৃত্তি পেয়ে থাকে। নিচে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের চিত্র তুলে ধরা হলো:

পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল-২০১৭

পরীক্ষার নাম	মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী	জিপিএ-৫	পাশের হার
পিইসি	৩০০	৩০০	২৭২	১০০%
জেএসসি	৩০৪	৩০৪	২৯২	১০০%
এসএসসি	৫৩৫	৫৩৩	৪২৪	৯৯.৬২%
এইচএসসি	৮৭৮	৮৭৭	৪৬৫	৯৯.৮৯%

সহপাঠ্যক্রমিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিতসাফল্য- ২০১৭

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা বছরব্যাপী প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সহপাঠ্যক্রমিক শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থাকার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ের বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতায়ও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করে থাকে। নিচে ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বহিরঙ্গণ প্রতিযোগিতায় এ কলেজের ছাত্রদের অর্জিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের চিত্র তুলে ধরা হলো:

১। ২-৪ জানুয়ারি ২০১৭, আদমজী কলেজ আইটি কার্নিভাল-এ- প্রোগ্রামিং কনটেস্ট এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জাইয়ান আহনাফ রহিম।

২। ২৬-২৮ জানুয়ারি ২০১৭, 5th Laboratorians National Science Festival-2017:

- Project Display (সিনিয়র গ্রুপ): চ্যাম্পিয়ন;
  ১. শরীফ আহমেদ (একাদশ), ২. তানভীর হাসান (একাদশ), ৩. সাদমান রহমান (একাদশ)
- Physics Olympiad (সিনিয়র গ্রুপ):
  ১. আল মুবিন- (একাদশ), ২. ফারহান মাসুক- (একাদশ), ৩. আরিয়ুম- (একাদশ)। এরা তিনজনেই দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে।
- Project Display (জুনিয়র গ্রুপ): তৃতীয় স্থান: ১. জুলকার নাইন, ২. আহমেদ নাভিদ, ৩. রাফসান আশহাব
- Quiz (সিনিয়র গ্রুপ): চ্যাম্পিয়ন
  ১. আবরার চৌধুরী- (দশম), ২. সাজিদ রাইয়ান আকাশ- (দশম), ৩. সাজেদুল হক ইয়াশফি- (দশম)
- Chemistry Olympiad (সেকেন্ডারি গ্রুপ): যৌথভাবে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে;
  ১. আজওয়ার সাইফ, ২. আবদুল্লাহ আনজুম, ৩. মো. জুবাইন আলম
- Sudoku: আহম্মেদ ইত্তিহাদ (দশম)- ২য়
- রুবিক্স কিউব: সিয়াম চৌধুরী (দশম)- ২য়
- Math Olympiad: আলি আবরার শুভ (একাদশ)- ১ম
- Biology Olympiad: মো. শাহরিয়ার আলম (একাদশ)- ১ম
- ICT Olympiad: হাসিব রহমান (একাদশ)- ২য়
- Physics Olympiad: আজিম রহমান (একাদশ)- ২য়
- Quiz (সিনিয়র): রানার্স আপ
  ১. রাফসান জাফর, ২. জুবায়ের আজিজ, ৩. ফারহিন আহমেদ

৩। ৫-৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, আহসানউল্লাহ ইউনিভার্সিটি কর্তৃক আয়োজিত Space Apps Next Gen- Dhaka এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে DRMC। দলের সদস্যরা হল: মো. শাহরিয়ার, ইনাম রহমান, মিনহাজুল ইসলাম এবং নাইমুল ইসলাম।

৪। ১৬-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, Bangladesh Textile University কর্তৃক আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে- Remians Debating Society.
বিতার্কিকরা হল: ১. সেজান মাহমুদ প্রান্ত (দ্বাদশ), ২. রেদওয়ান অর্ণব (দ্বাদশ), ৩. মোসাদ্দেক মীম (দ্বাদশ)

৫। ০২ মার্চ ২০১৭, চ্যানেল আই কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ব নারী দিবস বিতর্ক প্রতিযোগিতায় DRMC বিতর্ক দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। বিজয়ী বিতার্কিকরা হল:
১. নাফিস কাজী (একাদশ), ২. শফিকুল হাসান শাওন (একাদশ), ৩. মুবিন মজুমদার (একাদশ)

৬। ২-৪ মার্চ ২০১৭, 11th HGC কলেজ বিজ্ঞান মেলা:

- Quiz (চ্যাম্পিয়ন)-
  ১. আবরার চৌধুরী, ২. সাজিদ রাইয়ান, ৩. সাজেদুল হক ইয়াশফি
- Biology Olympiad (Senior):
  তাসফিক রহমান (একাদশ), ১ম
- Physics Olympiad (Senior):
  তাসফিক রহমান (একাদশ), ১ম

৭। ১৩ মার্চ ২০১৭, AIUB ECO- Festival এ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় রানার আপ হয়েছে DRMC বিতর্ক দল:
১. মোসাদ্দেক মিম (দ্বাদশ), ২. শফিকুল হাসান শাওন (একাদশ), ৩. মুবিন মজুমদার (একাদশ)

৮। ৯-১১ মার্চ, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান মেলা:

- Project Display (সিনিয়র): চ্যাম্পিয়ন,
  ১. নিলয় রায় (একাদশ), ২. আলী রাহাত (একাদশ), ৩. আহমেদ আব্দুর রাফি (একাদশ)
- Extempore Speech:
  ১. রিফাত নাইম- একাদশ (১ম), ২. এ. এ ফাইয়াজ রহমান- একাদশ (৩য়)
- Photography Competition: চ্যাম্পিয়ন
  আবু রাইহান মাহিন (একাদশ)
- IT Olympiad (সিনিয়র): দেবজিৎ বসাক (১ম)
- Biology Olympiad (সিনিয়র): শাখাওয়াত হোসাইন শোভন (২য়)
- Astronomy Olympiad (সিনিয়র): শাখাওয়াত হোসাইন শোভন (২য়)
- Soduko (সিনিয়র): রুবাইয়াত ইকোলো- একাদশ (৩য়)

৯। ১৪ এপ্রিল ২০১৭, সেন্ট গ্রেগরি কালচার আর্ট ফেস্টিভ্যাল এ রুবিকস কিউব এ চ্যাম্পিয়ন- মো. সিয়াম চৌধুরী (নবম)

১০। ১৫-১৭ মার্চ Institute of Energy, Dhaka University কর্তৃক আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় DRMC বিতর্ক দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সদস্যরা হলো:
১. নাফিস কাজী, ২. শফিকুল হাসান শাওন, ৩. মুবিন মজুমদার

১১। ২৩ মার্চ ২০১৭, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা:
১. ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ: জুনিয়র গ্রুপ (প্রথম): তামহিদুল ইসলাম-অষ্টম, মাধ্যমিক গ্রুপ (প্রথম): মো. তাওফিকুর রহমান-দশম
২. বিজ্ঞান বিভাগ: সিনিয়র গ্রুপ : মো. তাসফিক রহমান (প্রথম)
৩. গণিত ও কম্পিউটার বিভাগ: (সিনিয়র গ্রুপ), নাজমুস সাকিব রশিদ (প্রথম)
৪. বাংলাদেশ স্টাডিজ ও মুক্তিযুদ্ধ (জুনিয়র গ্রুপ), ত্বোহা ইমতিয়াজ আলিম (প্রথম)

১২। ১৬-২০ মার্চ- ২০১৭, MGBSDC কর্তৃক আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগতায় DRMC রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

১৩। ২৭ মার্চ ২০১৭, BTV কর্তৃক আয়োজিত মা ও শিশু বিতর্কে বিজয়ী DRMC। বিতার্কিকরা হলো:
১. নাহিয়ান আবরার (অষ্টম), ২. শুভজিৎ মণ্ডল (অষ্টম), ৩. অরিত্র ভট্টাচার্য (নবম)

১৪। ২৫-২৭ এপ্রিল ২০১৭, National Inter School Takewando Competition এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে DRMC.

১৫। ২-৩ আগস্ট ২০১৭, বিএএফ শাহীন কলেজ আয়োজিত বিজ্ঞান মেলায় সেকেন্ডারি লেভেলের কুইজ কম্পিটিশনে চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে DRMC.

১৬। ২৭ আগস্ট ২০১৭, NDC Science Carnival-2017 কুইজ সেকেন্ডারি লেভেলে চ্যাম্পিয়ন DRMC। দলের সদস্যরা হল:
১. আবরার চৌধুরী (দশম), ২. সাজিদ রাইয়ান (দশম), ৩. সাজেদুল হক (দশম)

১৭। ১৪-১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭, YWCA Inter School Quiz and Debate এ Debate Competition এ চ্যাম্পিয়ন রেমিয়ান্স ডিবেটিং সোসাইটি। দলের সদস্যরা হলো:
১. তামিম মিয়া (নবম), ২. আকিব সুলতান (নবম), ৩. সাইদুল্লাহ আনসারী (নবম)

১৮। ১৯-২১ সেপ্টেম্বর, 1st Josephite Culture and Adenture Festival এ Treasure Hunt প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন DRMC.

১৯। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত মাধ্যমিক স্কুল ভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতা জ্ঞানপিপাসু ২০১৭ এ জাতীয় পর্যায়ে Champion DRMC. দলের সদস্যরা হলো:
১. আবরার চৌধুরী (দশম), ২. সাজেদুল হক (দশম), ৩. সাজিদ রাইয়ান (দশম)

২০। ৫, ৬ ও ৭ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ St. Joseph Higher Secondary School কর্তৃক আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন DRMC.
দলের সদস্যরা হল: ১. নাফিস কাজী, ২. মুবিন মজুমদার, ৩. ওয়াসি চৌধুরী

২১। ২০ অক্টোবর ২০১৭, Debate For Humanity (DFH) কর্তৃক আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় রানার্স আপ হয়েছে DRMC.
দলের সদস্যরা হল: ১. সামদানী প্রত্যয় (একাদশ), ২. তৌহিদ সোহাদ (একাদশ), ৩. সৌগত দেবনাথ (একাদশ)

২২। ২৮-৩০ ডিসেম্বর ২০১৭ ক্যামব্রিয়ান কলেজ আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় রানার্স আপ হয়েছে DRMC.
দলের সদস্যরা হল: ১. নাফিস কাজী (দ্বাদশ), ২. মুবিন মজুমদার (দ্বাদশ), ৩. ওয়াসি চৌধুরী (একাদশ)

অবহেলা

ড. রুমানা আফরোজ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ছেলে হলো না বলে বাদলের বউয়ের লাঞ্ছনার সীমা রইল না। মেয়ে হয়েছে শুনে বাদল হাউমাউ করে কাঁদল। মেয়েকে আতুরঘরে দেখতেও গেল না। বউ তার নীরবে চোখ মোছে। অভিমানে চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। শ্বশুর বাড়িতে লিমার কোনো আদর-যত্ন হয় না। মেয়ে রুমিকে নিয়ে ঢাকা বদলি হয়ে আসে লিমা। ধীরে ধীরে গড়ে তোলে নিজের ছোট্ট সংসার। একসময় আবারো ছেলের প্রত্যাশায় লিমা দ্বিতীয়বার মা হওয়ার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এ স্বপ্নও বিধাতা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেন। এবার শুরু হয় লিমার একাকী জীবনযুদ্ধ। বাদল তাকে ফেলে চলে যায়। অনেক অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও রুমি আর ঝুমিকে ফেলে বাদল চলে যায়। সে আবার বিয়ে করে। সৃষ্টিকর্তা নীরবে হাসলেন। এবার তার ছেলে হলো পরপর দুজন।

রুমি-ঝুমি মায়ের কোলে বড় হয়। লিমা অনেক কষ্টে খেয়ে না খেয়ে মেয়ে দুটির যত্ন করে। তাদের যেন কোনো কষ্ট না হয়। এ ব্যাপারে সে ভীষণ তৎপর। রুমি খুব ভালো গান গায়, আর ঝুমি খুব সুন্দর ছবি আঁকে। মা তাদের নিয়ে স্বপ্নের জাল বোনেন।

ওদিকে বাদলের দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে যে ছেলে দুটি হয়, তারা দিনে দিনে বখাটে হয়ে যেতে থাকে। অফিস থেকে মিথ্যে চুরির অপরাধে বাদলকে জেলে পাঠানো হয়, সঙ্গে মার্ডার কেসের আসামি হিসেবেও পাপের প্রায়শ্চিত্তের শুরু হয় তার। জেলে যাওয়ার পর বাদলের দ্বিতীয় বউ অন্য লোকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। তার দুই ছেলে এতিম হয়ে নানার বাড়ি লালিত-পালিত হতে থাকে।

রুমি এখন অনেক বড়। SSC ও HSC-তে সে খুব ভালো রেজাল্ট করে। বিশ্ববিদ্যালয়েও ভালো বিষয়ে চান্স পায়। ঝুমিও বড় বোনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো ফলাফলের জন্য রুমি গোল্ড মেডেল পায়। অর্জন করে পিএইচডি ডিগ্রি। ঝুমিও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়। মায়ের চোখে আনন্দাশ্রু। তার সারা জীবনের কষ্ট সার্থক। কোথায় রুমির বাবা? লিমা ভাবে স্বামী থাকলে আজ তাদের সুখের সংসার হতো।

সোহাগ আর সৌরভ এলাকার নামকরা মাস্তান। তাদের সবাই ভয় পায়। বাদল জেলে বসে সব খবর পায়। হায়রে, সোনার ছেলেরা তার! কত স্বপ্ন দেখেছে ছেলেদের নিয়ে। সে বোঝে লিমার মনের কষ্ট অভিশাপ হয়ে নেমে এসেছে তার জীবনে। সে কি জেল থেকে ছাড়া পাবে না? সে কি পারবে তার মেয়েদের কাছে ক্ষমা চাইতে? সরকারের বিশেষ ক্ষমায় মুক্তি পায় বাদল। কোথায় খুঁজবে সে তার লিমাকে, তার রুমি-ঝুমিকে? ছেলেরা তার দিকে ফিরেও তাকায় না। বড় বোনের বাড়ি আশ্রয় পায় বাদল। সে আজকাল প্রায়ই স্বপ্ন দেখে ছোট্ট ঝুমি ঘুমিয়ে আছে বিছানায়, রুমি ছুটোছুটি করে খেলা করছে। স্বপ্ন ভেঙে চমকে ওঠে সে। মেয়ে বলে যাদের অবহেলা করেছে আজ তাদের স্বপ্ন তাকে দিন-রাত তাড়া করে ফেরে। বাদল মুক্তি চায়। সে ক্ষমা চায় এ জীবনের কাছে। কে তাকে ফিরিয়ে দেবে তার জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া চল্লিশটি বছর!!!

আগামী

মো. আরিফুল হক
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ

তা নিয়ে ভেবো না, ছিলে তুমি কী
ভাবো তুমি তা নিয়ে, কাল হবে কী।
অতীত ভাবনা ভাবতে কি আর থাকবে থেমে ধরণী?
বাদ দাও তার হিসেব কী করেছো, কী করনি।
কালকের ভাবনা ভেবে আর আজ কী হবে?
আজ যদি কিছু করো, কাল তা রবে।

বেয়ে চলো সমুখ পানে জীবন তরীখান
ফেলে পিছে সকল বাধা, সকল পিছুটান।
আত্মবিশ্বাস থাকে যদি, থাকে মনে জোর
অমানিশা কেটে একদিন হবেই হবে ভোর।
অধ্যবসায়ী মনে অটুট থাকলে সংকল্প
তোমার কীর্তিই হবে দেখো রূপকথার গল্প।
জয়মাল্য একদিন তোমার শোভা পাবে গলে
সাধনার ফল জেনো যায় না বিফলে।

পড়ালেখার প্রতি ভালোবাসা

আব্দুল কুদ্দুস
প্রভাষক, যুক্তিবিদ্যা, দিবা শাখা

১

পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও ভয়ঙ্কর পারমাণবিক অস্ত্রের চাইতেও জ্ঞানীর কলমের কালি সম্ভবত বেশি শক্তিশালী। জ্ঞানই মানুষকে অন্যান্য সব প্রাণীর উপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি শিখিয়েছে এবং পরস্পরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমও জ্ঞান। পৃথিবীতে খ্যাতিমান, নামিদামি হওয়ার বিভিন্ন উপায় আছে; যেমন ভালো খেলোয়াড় হওয়া, ভালো গায়ক, নায়ক, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু মানব ইতিহাসে হাজার বছর ধরে অবদান রাখতে পারেন কেবল জ্ঞানীরাই। যেমন, আড়াই হাজার বছর আগের পিথাগোরাসের সূত্র ছাড়া গণিতের জগতেই ঢোকা যায় না। সব যুগেই বিভিন্ন কারণে পড়ালেখা ও জ্ঞান চর্চার প্রতি মানুষের আকর্ষণ কম। বর্তমানেও ছাত্র-শিক্ষক, চাকুরে-শ্রমিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ আমরা প্রায় সবাই নিজস্ব পরিধি বা পেশাসংক্রান্ত কিছু জ্ঞান নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকার চেষ্টা করি। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই জ্ঞানও ঠিকভাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা করি না, অথচ আমাদের উচিত ছিল এর বাইরেও মানবীয় চেতনা, নৈতিক বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত বিভিন্ন বই পড়ে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানচর্চা করা।

নিজেকে একটু প্রশ্ন করে দেখি তো, আমাকে কি বড় হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়? আমাকে কি এমন কোনো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া উচিত, যার কারণে অন্যরা আমাকে সম্মান করবে, স্নেহ করবে, অন্তত অভদ্র-বেয়াদব বলবে না? আমার কোনো মহৎ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ যদি অন্যরা আমাকে সম্মান করে, আমার প্রতিষ্ঠানের বন্ধুরা আমাকে ভালোবাসে তাহলে সেটা কি গৌরবের বিষয় নয়? আমি বিশ্বের, কিংবা দেশের কিংবা সমাজ বা প্রতিষ্ঠানের নামকরা কেউ যদি নাও হতে পারি তবুও আমার বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তানের কাছেও কি বড় হতে পারব না? সম্ভবত এসব প্রশ্নের উত্তরে সবাই হ্যাঁ বলবেন। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব? সহজ কথায় এর উত্তর হতে পারে বই পড়ে ও জ্ঞান সাধনা করে।

কেউ কেউ এতে ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন। তারা বলবেন, পড়ালেখা না করেও মহামানব হওয়া যায়। সুতরাং পড়ালেখার পেছনে সময় নষ্ট না করে জীবনকে গল্প-গুজব, আড্ডাবাজিতে উপভোগ করাই ভালো। তাদের সম্মানে কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করলে আশা করি তাঁরা খুশি হবেন।

যুক্তি-১ : মঙ্গোলিয়ার প্রতাপশালী শাসক হালাকু খান মুসলিম বিশ্বের রাজধানী বাগদাদকে ধ্বংস করে এর সুবিশাল লাইব্রেরিগুলো পুড়িয়ে ফেলেন, লাখ লাখ বই ফোরাত নদীর স্রোতে ঢেলে দেন, তাতে তাঁর খ্যাতির কমতি হয়নি! যদি তিনি পড়ালেখা জানতেন তাহলে অন্তত নিজের জন্য হলেও দু-চারটা বই রেখে দিতেন!

যুক্তি-২ : ভাগ্যও অনেক সময় হঠাৎ কাউকে বীর ও খ্যাতিমান বানিয়ে দেয়। শেখ সাদীর গুলিস্তাঁয় একটা গল্প পড়েছি। একজন রাজা দূরবর্তী একটি সূক্ষ্ম নিশানাকে ভেদ করার জন্য দক্ষ তীরন্দাজদের প্রতিযোগিতায় ডাকলেন। কেউ পারলেন না। শেষ বিকেলে একজন রাখাল খেলা করতে গিয়ে তার একটি তীর ঘটনাক্রমে সেই রাজার নিশানাকে ভেদ করে। অমনি রাজার হাতের মহা পুরস্কার ও রাজকীয় সম্মান নিয়ে সে বাড়ি ফেরে। বুদ্ধিমান রাখাল জীবনে আর কোনো দিন তীর ছোঁড়েনি।

যুক্তি-৩: স্বজাতিকে রক্ষার জন্য রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে থাকা কোনো বাহিনীকে হঠাৎ যদি কোনো ডাকাত দল এসে সহযোগিতা করে এবং এতে বিজয়ী হয় তাহলে ঐ ডাকাত দলকে সবচেয়ে বড় পুরস্কার দেয়াটাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ তাদের সারা জীবনের পাপ ঢাকা পড়ে তারা এখন বিজয়ী বীর।

যেসব ছাত্র পড়ালেখা না করে কিংবা কম করেই ভালো ফলাফল এবং ভালো চাকরি ও ভালো পেশা বা সম্মানের অধিকারী হতে চায় তাদের জন্য উপরের যুক্তিগুলো প্রেরণা সৃষ্টি করবে এবং তারা তা জেনে হয়তো এ কারণেই পড়ালেখায় অলসতা করে। যে অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে, কিন্তু ধীরে ধীরে পরে নিজের মেধা, যোগ্যতা ও অধ্যবসায়ের সাথে প্রতারণা করে নিজেকে অজানা স্রোতে ভাসিয়ে দেয় তাঁর সম্মানেই উপরের কথাগুলো।

২

ছাত্রজীবনে যারা নিজেদের অতি চালাক, অতি বুদ্ধিমান ও অত্যন্ত প্রতিভাবান মনে না করে নীরবে বা সরবে পড়ালেখা ও জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে বড় হতে চায় এবার তাদের সম্মানে কয়েকটি কথা।

গৌতম বুদ্ধ দিনের পর দিন গভীর অরণ্যে নির্জন এক বৃক্ষের নিচে ধ্যানে বসে ভাবেন, কীভাবে জগতের মানুষের দুঃখ দূর করা সম্ভব। অবশেষে তিনি পেলেন। যা পেলেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে জগতের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যার মূল কারণ অজ্ঞতা বা অবিদ্যা। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন, অজ্ঞতা থেকেই সমস্ত পাপের উদ্ভব। মহানবী (সা) জ্ঞানকে এতই উপরে স্থান দেন যে, অপাত্রে জ্ঞান দান করাকে শূকরের গলায় স্বর্ণ-রৌপ্য-মনিমুক্তার মালা পরানোর সাথে তুলনা করেন। সুতরাং জগতে সুখী হওয়ার জন্য, সমস্ত পাপ থেকে বাঁচার জন্য এবং অন্তত 'শূকরের' মতো না হওয়ার জন্য আমাদের পড়ালেখা করতে হবে এবং প্রকৃত জ্ঞান দ্বারা নিজেদের আলোকিত করতে হবে। এই জিনিসটির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন লোকমান পণ্ডিত। জীর্ণ কাপড় পরে বাগদাদের পথে তিনি ভ্রমণ করছিলেন। একজন লোক তার পলাতক দাস ভেবে তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। এক বছর পর সে হারানো দাসকে খুঁজে পায়। লোকমানের পরিচয় জেনে সে তাঁর কাছে ক্ষমা চায়। কিন্তু তিনি বললেন, 'আমি দাসত্বের জ্ঞানার্জন করে ধন্য হয়েছি।' ইমাম বুখারি মহানবী (সা)-এর একটি মাত্র জ্ঞানর্ভ বাণী খুঁজে পেতে শত শত মাইল পথ ভ্রমণ করেন।

জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োজন গভীর সাধনা ও তপস্যা। টমাস আলভা এডিসন বৈদ্যুতিক আলো জ্বালানোর জন্য ৩ হাজার তত্ত্ব দাঁড় করেন এবং ১৬শ রকমের পরীক্ষা করে অবশেষে চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করেন। যার ফলশ্রুতিতে আমরা আলো ঝলমল রাত কাটাচ্ছি। বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বার্নাড'শ শুরুর জীবনে কয়েকটি উপন্যাস লিখলেন, কিন্তু কোনো প্রকাশককে পেলেন না ছাপাতে। নাটক লিখলেন, মঞ্চস্থ করা হলো দর্শক নেই। প্রথম নাটক দেখে ইংল্যান্ডের প্রিন্স অব ওয়েলস বলেই ফেললেন, নাট্যকার নিশ্চয়ই 'পাগল'। এই 'পাগল'ই পরে তাঁর নোবেল পুরস্কারের প্রাপ্ত টাকা উদীয়মান তরুণ কবি সাহিত্যিকদের উৎসর্গ করেন।

ইসমাইল হোসেন সিরাজীর ১০টি টাকা নজরুলের কাব্য সাধনায় সৃষ্টি করেছিল প্রচণ্ড গতি। সিরাজী সাহেব নজরুলকে লেখেন, 'তোমার লেখা পড়িয়া সুখী হইয়া ১০টি টাকা পাঠাইলাম। ফিরাইয়া দিও না, ব্যথা পাইব, আমার থাকিলে ১০ হাজার টাকা পাঠাইতাম।' জ্ঞান সাধনার জন্য ১০ টাকার প্রেরণাই যথেষ্ট। আধুনিক মালয়েশিয়ার সফল রূপকার মাহাথির মুহাম্মদকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কীভাবে তিনি বড় হলেন? বললেন, 'একটি বড় ছবি দেখে ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করে।'

আমরা কীভাবে জ্ঞানার্জন করব? প্রথমত, পাঠ্যপুস্তক যথাযথভাবে পড়ে, দ্বিতীয়ত ভালো বই পড়ে। পাঠ্যবইয়ের গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, বিভিন্ন পাঠ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখা একটি ডাইরিতে লিখে রাখতে পারি। ছাত্রজীবন শেষে দেখা যাবে এ এক বিরাট সঞ্চয়। জীবনকে সুন্দর করতে ভালো বইয়ের প্রয়োজন। ডা. লুৎফর রহমান, ডেল কার্নেগির বই এ ক্ষেত্রে খুবই কাজে লাগবে। সক্রেটিসের মৃত্যুর দৃশ্য নিয়ে আঁকা 'প্লেটোর সংলাপ'-এ আছে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নীতিবান থাকার গল্প। হ্যামলেট, শেষ বিকালের কান্না, কায়সার ও কিসরা, শেষ প্রান্তর, সপ্তপদী ইত্যাদি নাটক উপন্যাসে আছে প্রেম-বিরহ ও ইতিহাসের বিখ্যাত ঘটনা প্রবাহ। Hundred Great Adventures of the World নামক বইটি দুঃসাহসিক অভিযানে ভরা খুব মজার বই। নিজেদের ধর্ম গ্রন্থ না পড়লে নৈতিকতার মূল শিক্ষা পাওয়া যায় না। একজন মুসলিমের জন্য পবিত্র কোরআন শরিফ অর্থসহ প্রতিদিন মাত্র ২ পৃষ্ঠা করে পড়লেও বছরে একবার শেষ করা যায়। এতে সময় লাগবে প্রতিদিন বড়জোর ৫-১০ মিনিট। একজন হিন্দুকে অবশ্যই বেদ পড়া উচিত, একজন বৌদ্ধকে অন্তত 'সুত্তপিটক' নিয়মিত পড়া উচিত, একজন খ্রিস্টানের কাছে অবশ্যই বাইবেল থাকা উচিত। তবে নিজ পাঠ্যপুস্তকের জন্য অবশ্যই প্রতিদিন ৬/৭ ঘণ্টা সময় বের করতেই হবে। প্রতিদিন ৭ ঘণ্টা ঘুমের পরও কেন ৭ ঘণ্টা পড়ালেখা সম্ভব নয় সে জন্য আত্মসমালোচনা করতে হবে। একটি নোট বইয়ে সেই কাজগুলোর নাম লিখতে শুরু করি যেগুলো আমার পড়ালেখায় বাধা দেয়। এরপর গভীরভাবে চিন্তা করি সে কাজগুলো আমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে আত্মসমালোচনা করলে প্রতিদিন অবশ্যই আমার উন্নতি ঘটবে। একজন শিক্ষকের সাথে নিজের সমস্যাগুলো আলোচনা করা যায়, তিনি নিশ্চয়ই ভালো পথ দেখাবেন।

পৃথিবীতে বর্তমানে ভালো মানুষের খুব অভাব এ কথা সত্য। তবে আগেও এ ধরনের অভাব ছিল এবং ভবিষ্যতে তা আরো বাড়তে পারে এবং আমার একটু ভূমিকার কারণে তা কমেও যেতে পারে।

৩

এবার একটি সৃজনশীল প্রশ্নের উল্লেখ করছি।

বাবা তার তিন বছরের শিশু কন্যাকে নিয়ে এক পড়ন্ত বিকেলে মরুভূমির পথ পাড়ি দিয়ে হেঁটে চলছেন। 'বাবা : আমরা কোথায় যাচ্ছি?'– 'আমরা ভ্রমণে যাচ্ছি।' এভাবে শিশুটি বাবার হাত ধরে কত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে যাচ্ছে। এক সময় তাদের ভ্রমণ শেষ হলো। বাবা এক জায়গা দাঁড়িয়ে মাটি ও পাথর সরিয়ে একটি গর্ত করছেন। শিশুটি বাবাকে সাহায্য করছে। ঘামে, ধুলাবালিতে প্রিয় বাবার চেহারা ধুলামলিন হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটি সযত্নে স্নেহভরা কোমল হাতে সেগুলো মুছে দিচ্ছে। এক সময় খনন কাজ শেষ হলো। এরপর যা হয়েছে তার কোনো ছবি আঁকা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে এতটুকুই বলব, মেয়েটি 'বাবা!' 'বাবা!' বলে চিৎকার করতে করতে চিরদিনের জন্য চলে গেল।

ক) সক্রেটিসের উক্তিটি কি ছিল?

খ) একজন অতি চালাক ও অতি বুদ্ধিমান ছাত্র কেন ছাত্র ও কর্মজীবনে বেশি ব্যর্থ হয়?

গ) পিতার এ নিষ্ঠুর আচরণে কোন বিষয়টি কাজ করেছে? 'পড়ালেখার প্রতি ভালোবাসা' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ) উক্ত সমস্যা থেকে মানবসভ্যতাকে বাঁচানোর জন্য সচেতন মানুষ হিসেবে আমাদের কী ভূমিকা হতে পারে? বিশ্লেষণ কর।

স্টুডেন্টস কর্নার

বাংলা লিখন

ছড়া ও কবিতা

বিখ্যাত খাবার

তাহামিদ হাসান
কলেজ নম্বর : ১৫২৩৭
শ্রেণি ও শাখা : তৃতীয়-খ (প্রভাতি)

বরিশালের আমড়া
নরসিংদীর কলা
রাজশাহীর লিচু আম
মিষ্টি মধুর ফলের নাম।
মিষ্টি দই খেতে চাও?
বগুড়াতে চলে যাও।
কুমিল্লার রসমালাই
খাবে যদি এসো ভাই।
চমচম খেতে চাইলে
টাঙ্গাইল যাও চলে।
বন্ধুর বাড়ির খেজুর গুড়
খেতে যাবো ফরিদপুর।
নাটোরের কাঁচা গোল্লা
বলবো কী আর, মাশাল্লাহ।

মহান নেতা

সিলমী সোহেল
কলেজ নম্বর : ১৫২৩৫
শ্রেণি ও শাখা : তৃতীয়-খ (প্রভাতি)

স্বপ্ন দেখি ঘুমের ঘোরে
মহান নেতা তুমি।
তোমায় দেখে চলছে সবাই
শুনছে কথা সবই।
দুষ্টরা সব ভেবে মরে

মরণ এলো বুঝি,
মুজিব নামে কাঁপন ধরে,
আমরা বলি খুশি।
আমরা যা চাই সবই মেলে
থাকে না কোনো বাকি।
খেলার মাঠে খেলে বেড়াই
ইচ্ছেমতো ঘুরি,
কোকিল ডাকে স্বপ্ন ভাঙে
ভোরের আলোয় খুঁজি।
কোথায় আছ জাতির পিতা?
কেমন আছ তুমি?
তোমার মতো নেতা হব
স্বপ্ন দেখি আমি।

বাংলার নিবাস

হাসনাত হাশমী ঈসান
কলেজ নম্বর : ১৫২৬৫
শ্রেণি ও শাখা : তৃতীয়-খ (প্রভাতি)

পাখির গানে,
মাটির টানে,
ফুলের বাসে,
নদীর পাশে,
সবুজ নিবাসে,
আমার বাস।
ফুলের পাতায়
মেঘের ছাতায়
নদীর পাড়ে
আকাশের ধারে ছোট একটি গ্রাম।
ফুলের গন্ধে,
গানের ছন্দে,
দিনের শেষে
রাতের বসে।

শ্রেষ্ঠ বন্ধু

আরাফাত রহমান
কলেজ নম্বর : ১৫৩৫৫
শ্রেণি ও শাখা : তৃতীয়-গ (প্রভাতি)

সবার চেয়ে মিষ্টি বন্ধু,
হলো আমার বই,
বইয়ের সাথে সখ্য আমার
মনের কথা কই।
মানুষ বন্ধু ঝগড়া বাঁধায়
বন্ধ করে কথা,
বইয়ের বেলায় তা ঘটে না
দেয় না মনে ব্যথা।
যত বন্ধু দেখেছি আমি
বইয়ের মতো নয়,
বই-ই আমার জীবনটাকে
করেছে স্বপ্নময়।
আমার কোন বিপদ এলে
পালায় না সে দূরে।
বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করে যতটা সে পারে।
এসব কথা ভেবে আমি এই করেছি পণ,
বইয়ের সাথে বন্ধুত্ব রাখব সারাক্ষণ।

বর্ষা

অনিন্দ্য প্রতিম সিনহা
কলেজ নম্বর : ১৪৫২৯
শ্রেণি ও শাখা : চতুর্থ-ক (প্রভাতি)

টুপটাপ ঝুমঝুম
পরে যে বর্ষা,
তাকে দেখে দেখে
মনে জাগে ঈর্ষা।
আকাশ থেকে ঝরতে,
নেই কোনো মানা।
তার মতো যাবো কোথায়
কার আছে জানা?
বর্ষা মোদের সজীব করে
সজীব করে মন,
বর্ষার মতো বাঁধা মোরা
বন্দি এ জীবন।

শিক্ষক

শাহ্ মো. নাহিয়ান
কলেজ নম্বর : ১৫৩০২৪৭
শ্রেণি ও শাখা : পঞ্চম-ক (প্রভাতি)

শিক্ষক হলেন সবার গুরু, সবচেয়ে জ্ঞানবান।
শিক্ষক হলেন শিক্ষাগুরু, শিক্ষা করেন দান।
শিক্ষক এ দুনিয়াতে সর্ব মহান,
সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র তার আপনারি প্রাণ।
তার গায়ে জ্ঞানের সু-গন্ধ,
তার মনে পাপের দরজা বন্ধ।
তার কাছে সবচেয়ে বেশি সময়ের দাম।
দেশ-বিদেশ সু-খ্যাতি তার, অনেক সুনাম।
তিনি হলেন দেশের শক্ত মেরুদণ্ড।
দেশের ভিতর মণি মানিকের বড় একটি খণ্ড।
তার মাথাতে জ্ঞানের সাগর, সমুদ্র-সিন্ধু।
সাগর তিনি, কিন্তু নিজেকে ভাবেন জ্ঞানেরই এক বিন্দু।
জ্ঞানেই তার জীবন, তার জ্ঞানেই তার দীন।
জ্ঞানের ক্ষুধায় সে যেতে পারে, দেশের নাম চীন।
শিক্ষকেরই মর্যাদা যে অতি,
তাই দেখে পোষ মানবে বন্য ঐরাবত।
তিনি হলেন সর্ব সত্য, সবচেয়ে বেশি সৎ।
তিনি হলেন সর্বজ্ঞানী, সবচেয়ে মহৎ।
অনেকখানে তার, অনেক সুনাম-খ্যাতি।
পুরো জ্ঞানের সাগর যেন, শুধুই তারই।
তিনি হলেন বিশ্বের, বিখ্যাত পণ্ডিত।
তার ভাণ্ডারে সব সময় জ্ঞানেরই জিত।
শিক্ষকের জ্ঞান ভরা তারই নিজের জ্ঞান।
কিন্তু তার কাছে জ্ঞানের চেয়ে বড়, তার আপন মান।
শিক্ষক হলেন সবচেয়ে জ্ঞানী, সবচেয়ে গুণী।
শিক্ষকের কাছে আমরা সব সময় ঋণী।

একটুখানি ভাবো

মাহমুদ জিলানী
কলেজ নম্বর : ১৫৩০১৬৭
শ্রেণি ও শাখা : পঞ্চম-ক (প্রভাতি)

জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলের মজা
কেমন করে পাবো,
ফলে নাকি বিষ মেশানো
কেমন কথা ভাবো।
এমন কথা শুনেছো কেহ
নিজের খাবার নিজে
কেমন করে নষ্ট করে
ফরমালিন মিশে।
রসের মাসে ভাত কম
ফল খাবে বেশি,
এসব কথা বলো না আজ
দুঃখ রাশি রাশি।
এমন কাজ করছো যারা
বলি তোমাদের শোন
ভালো ভাবে বাঁচতে দাও
আমরা শিশু যেন।

'মা'

রাইয়ান আহমেদ
কলেজ নম্বর : ১৫১০৪৪৮
শ্রেণি ও শাখা : পঞ্চম-খ (প্রভাতি)

'মাগো' তুমি কোথায় আছো
জানতে ইচ্ছে করে,
সারাক্ষণই তোমার কথা
আমার মনে পড়ে।
তোমার কোলে জন্ম আমার
তুমি জীবন-মরণ,
বড় হয়ে করব আমি
তোমার দুঃখ হরণ।
মাথা রেখে তোমার কোলে
যাই যে আমি দুঃখ ভুলে,
তোমার সেবা করলে পরে
স্বর্গ সুখ পড়বে ঝরে।

সুখের হাওয়া

নূর মোহাম্মদ তালুকদার সৌরভ
কলেজ নম্বর : ১৫১০২৪০
শ্রেণি ও শাখা : পঞ্চম-খ (প্রভাতি)

নষ্ট জীবন
নষ্ট ভাবা,
কষ্ট পাওয়া শুধু
স্পষ্ট করে যায় না বলা
কোথায় সুখের বিধু।
কোথায় আছে সুখের আকাশ
কোথায় সুখের হাওয়া,
হঠাৎ মাঝে দেখা গেলেও
যায় না তাকে ছোঁয়া।

ঢাকা শহর

মো. মুশফিকুস সালেহীন
কলেজ নম্বর : ১৫২০৪০১
শ্রেণি ও শাখা : পঞ্চম-গ (দিবা)

ঢাকায় আছে হরেক রকম বাড়ি
রাস্তায় দেখা যায় শত শত গাড়ি।
অনেক মানুষ মনে করে কত সুন্দর ঢাকা,
ঢাকায় এলে বদলে যাবে জীবনের চাকা।
ঢাকায় আছে পকেটমার
আছে ছিনতাইকারী,
তাদের কেউ নর, কেউ আবার নারী।
মাছের সাথে খাচ্ছি বিষ
চালের সাথে পাথর!
কেউ কি জানে এভাবে
চলবে কত বছর?

মা

সাদ্ বিন কামাল
কলেজ নম্বর : ১৩৯৭৪
শ্রেণি ও শাখা : ষষ্ঠ-ক (প্রভাতি)

আমার মায়ের মুখের ভাষা
মিটায় আমার মনের আশা,
মা যদি না বলে কথা
মনে আমার লাগে ব্যথা।
মায়ের মুখের মিষ্টি হাসি
প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি,
মায়ের চোখে দেখলে জল
হারায় আমার সকল বল।
মা আমার প্রাণের হাসি
হাসিতে তার ফুলের রাশি।
মা-ই হলো চোখের আলো
তাই তো মাকে লাগে ভালো

একটা মানুষ

কে. এস. নাজমুল সাদাত
কলেজ নম্বর : ১৩৯০৭
শ্রেণি ও শাখা : ষষ্ঠ-খ (প্রভাতি)

একটা মানুষ সাদা মনের
একটা মানুষ কালো;
একটা মানুষ সব হারিয়েও
বাসতে জানে ভালো।
একটা মানুষ হাজার খুঁজেও
পায় না মনের দেখা;
সব মানুষই সত্যিকারে
ভীষণ রকম একা।

'প্রিয় মানুষ'

নাফিস ফুয়াদ
কলেজ নম্বর : ১৫৪২৫
শ্রেণি ও শাখা : ষষ্ঠ-ঘ (প্রভাতি)

বাবা অতি প্রিয়জন
আমার জীবনে
তাঁর মতো আর নেই
প্রিয় কেউ এই ভুবনে।
বাবা আমার আশা-ভরসা
আমার জীবনের আলো,
সব মানুষের চেয়ে তিনি
আমার কাছে ভালো।
যত আবদার যত কথা
বাবার কানেই যাবে,
বাবার মতো প্রিয়জন
কেউ কি খুঁজে পাবে?
বাবার কাছে আমার যত
গল্প আর হাসি,
তাইতো আমি সবার চেয়ে
তাকেই ভালোবাসি।
বাবা আমার প্রিয় মানুষ
সবচেয়ে আপন,
এমন বাবা পেয়ে আমার
ধন্য হলো জীবন।

বাংলাদেশ ও ক্রিকেট

জয়দীপ ওঝা
কলেজ নম্বর : ৭৯৬৮
শ্রেণি ও শাখা : ষষ্ঠ-খ (দিবা)

ক্রিকেট খেলা মজার খেলা
শরীর ভালো থাকে,
ক্রিকেট হলো বুদ্ধির খেলা
মনও ভালো রাখে।
ক্রিকেট খেলার জনক বলে
ইংল্যান্ডকে ভাই,
শচিন হলো বিশ্বসেরা
তাহার সমান নাই।
মুস্তাফিজ কাটারমাস্টার
নতুন আবিষ্কার,
সাকিব-সৌম্য-মাশরাফিরা
খেলে চমৎকার।

তামিম যখন ছক্কা মারে
বল হারিয়ে যায়,
মাহমুদউল্লাহ্‌র সেঞ্চুরিতে
বাংলাদেশের জয়।

১৬ ডিসেম্বর

আসিম হায়দার চৌধুরী
কলেজ নম্বর : ৯৫০১
শ্রেণি ও শাখা : ষষ্ঠ-গ (দিবা)

করছি আমি বাস, শত্রুমুক্ত দেশে আজ
সেজেছে বাংলাদেশ, স্বাধীনতার সাজ।
পেয়েছি আমরা স্বাধীনতা
পেয়েছি পতাকা,
চারদিকে সবুজের মাঝে
লাল বৃত্তটা।
দেখতে দেখতে চলে এলো
১৬ ডিসেম্বর,
১৯৭১ সাল যে,
রক্তের নম্বর।
পেয়েছি বিজয়ের সাজ
বিজয় দিবস আজ।

বাংলা মায়ের সাজ

মো. মুস্তাকিমুর রহমান
কলেজ নম্বর : ৮০১৯
শ্রেণি ও শাখা : ষষ্ঠ-গ (দিবা)

আমার প্রিয় জন্মভূমি, সবুজ বাংলাদেশ,
কতো রঙিন ছবি আঁকা রক্তের সমাবেশ।
সকাল বেলার সূর্য উঠা, সাঁকের রঙিন আলো,
রাতে এমন পূর্ণিমা চাঁদ কোথায় পাবে, বলো?
জয়নুল আর কবিগুরু রং দিয়েছেন যতো,
তাহার চেয়েও হাজার রঙের শোভা মনের মতো।
গ্রীষ্মকালের ভয়াল রঙে, ভয় লাগে যে কতো,
বর্ষাকালে গোমরা মুখে কান্না অবিরত।
শরৎকালের কাশফুল, আর মরা নদীর চরে,
বালুর সিঁড়ি আঁকা যেন দেখি দু'চোখ ভরে।
হেমন্তের ঐ ভোরের হাওয়া শীতের ছবি আঁকে,
পাতা ঝরা বৃক্ষ আবার বসন্তকে ডাকে।
লক্ষ ফুলের রং ছড়িয়ে নতুন পাতা আজ,
বাংলা আমার বসন্তে দেয় দৃষ্টিকারা সাজ।
এমনিভাবে ষড়ঋতু কতো রঙে আঁকে,
কতো সাজে দেখি মোরা জন্মভূমি মা'কে।

মানব

মো. ফেরদৌস সিদ্দিকী
কলেজ নম্বর : ৮৬৪০
শ্রেণি ও শাখা : সপ্তম -খ (দিবা)

আজব সৃষ্টি মানব
তার মাঝেই মহান সত্তা, তার মাঝেই দানব।
রাজার সাথে রাজা লড়ে
প্রজার সাথে প্রজা
এর মাঝে কী আশার আলো
যায় কখনো খোঁজা?
বিবেক এবং সংসার ছাড়া
মানুষেরা আজ ছন্নছাড়া
উন্নয়নের পথে কাঁটা হয়ে
মানুষেরা আজও গেছে রয়ে।
আশা আছে এরই মাঝে,
আলো জ্বালে এই মানুষই
ব্যস্ত যারা নিজের কাজে।
শিক্ষা অর্জন করে প্রকৃত মানুষ তারা
জ্ঞান বুদ্ধির সমন্বয়ে দেশ পাল্টালো যারা।
মানুষ তারা জয় করে যারা, সব মানুষের মন
সেই মহীয়ান, সেই গরীয়ান, শ্রেষ্ঠ সে জন।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

মো. ফারহান শিহাব
কলেজ নম্বর : ৭৪৪২
শ্রেণি ও শাখা : সপ্তম -গ (দিবা)

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ,
এখানকার ছাত্রদের আছে ব্রেইন ভরতি নলেজ।
DRMC-তে রয়েছে হাজার হাজার ছাত্র,
তাদের মধ্যে একজনও নেই, Fail করার পাত্র।
খেলাধুলা করি আমরা এই কলেজের মাঠে,
মনোরম দৃশ্য রয়েছে এর পুকুর ঘাটে।
অধ্যক্ষের বাণী শুনে, হই আমরা মশগুল,
ইচ্ছে করে শ্রদ্ধা জানাই দিয়ে নানান ফুল।
এই কলেজ সবুজ ঘেরা, পাখি আর বন,
কখনও এই কলেজকে ছাড়তে চায় না আমার মন।
খেলাধুলার পাশাপাশি পড়াশুনায় অনেক ভালো,
তাইতো এই কলেজটি পায় যোগ্যতার আলো।
পড়াশুনায় সাহায্য করেন এখানকার ম্যাডাম এবং স্যার,
তাইতো সবার পড়তে ইচ্ছে করে এই কলজে বারবার।

পাখির বাসা

মো. নিয়ামত আলী (রাসেল)
কলেজ নম্বর : ৭০৪৫
শ্রেণি ও শাখা : অষ্টম -খ (দিবা)

একটি পাখির বাসা ছিল
উঁচু গাছের ডালে,
হাওয়ার বেগে বাসাটি তার
দুলতো তালে তালে,
মা পাখিটি সেই বাসাতে
তিন জোড়া দেয় ডিম,
ডিম ফুটে হয় ছানা
আসলো সুখের দিন।
দিনে দিনে বড় হলো
পাখির ছয়টি ছানা
বাসা ছেড়ে গেল উড়ে
মেলে দুটি ডানা।

মানবতা

আজওয়াদ আখলাক
কলেজ নম্বর : ৭১১৫
শ্রেণি ও শাখা : অষ্টম -খ (দিবা)

হে মানব তুমি হয়েছ দানব–
যখনই পেয়েছ টাকা,
টাকারই লোভে মানবতা তোমার–
গিয়েছে সদা ঢাকা।
কেউ আছে সর্বশিখরে–
কেউ তব মাথাপিছু,
কারও আছে যাই বল সব–
কারো নেই কোনো কিছু।
একটিবারও কি পারি না আমরা–
সবে মিলে হই ভাই?
মানুষে মানুষে আমরা সবাই–
মাঝে কোনো ভেদ নাই।
চোখ খুলে দেখ নিঃস্ব গরিব–
কত মানুষ অসহায়,
কী করেছে তারা– দু'হাত তুলে তো
কিছু সাহায্য চায়!
একটিবার কি পারি না আমরা–
বাড়াতে নিজের হাত,
সবে মিলেমিশে সুখে দুঃখে
কেটে যাবে দিন-রাত।
মনে রেখো সবে আমাদের সাড়া–
সেই আদি পিতা-মাতা,
বিচারের দিন দেখানো হবে–
তোমারও পাপের খাতা।
চলো, ধনী গরিবের পরিচয় ভুলে–
ভুলে যাই জেতের ফাতা,
এইটুকুই তো স্বপ্ন ছিল
স্বপ্নেরও মানবতা।

বীর বাঙালি

মোর্শেদ খান ইফরান
কলেজ নম্বর : ১৫৪৮৫
শ্রেণি ও শাখা : নবম -ক (প্রভাতি)

আমরা বাঙালি বীর
বাংলাকে ভালোবাসি,
বিঁধে যদি বুকে তীর
হাসবো সুখের হাসি।
দেখেছি যে অবিচার,
নির্যাতন-নির্মমতা,
শিখিনি মানতে হার
তাই পেয়েছি স্বাধীনতা।
রক্ত ঝরানো রাত
ভুলব না কোনো দিন,
ভেঙে দিব বিষ দাঁত
হালকা করবো ঋণ।
তোমার রক্ত দ্বারা
খেলেছিল যারা হোলি,
হবে তারা দিশেহারা
আজ পণ করে বলি।
কাঁদে বাংলার আকাশ
তোমায় পড়লে মনে,
কাঁদে নির্মল বাতাস
পিতা আছো জনে জনে।
যতই আসুক বাধা
আসবে যত বিপত্তি,
শিখিনি আমরা কাঁদা
করি বিজয়ের মাস্তি।
এসো মোরা একসাথে
গাহি বাংলার গান,
আজ বিশ্ব দরবারে
বাঙালিরা মহীয়ান।

ছোট্ট সেই গ্রাম

আব্দুল্লাহ ইবনে ওসমান দুর্জয়
কলেজ নম্বর : ১৫৫১৫
শ্রেণি ও শাখা : নবম -গ (প্রভাতি)

আমার দিনগুলো কেটে যায়
মোহনী এই গাঁয়
হেঁটেছি কত বনের পথে
পথের ঘাসের সিক্ত শিশিরে
গ্রামটি এখন দূরে
পাখি ডাকে গাছে গাছে
ফুল ফোটে শাখে শাখে
রাতের চাঁদ চলে যায়
ভোরের আভায় মন রাঙায়
আজ এ বসন্তে নিশ্চুপ আমি
তুমি কাছে নেই বলে–
প্রকৃতির রানি।

এই শ্রাবণে

আব্দুল মাবুদ শাহরিয়ার খান
কলেজ নম্বর : ১৫৪৮৩
শ্রেণি ও শাখা : নবম -ঘ (প্রভাতি)

এই শ্রাবণে ভিজবই আমি,
যত জ্বর আসে আসুক,
যত ঝড় আসে আসুক,
যত বকা দাও না,
শুনবোই না আমি।
জল পুকুরে নামবোই
যতই ঘোলা হোক,
আমি সাঁতার কাটবই,
ঐ জলের ব্যাঙাচিদের সাথে,
খেলবই আমি।
জলকেলি করবই,
ভিজবই আমি জলে।

মা

সাইমুন ইসলাম জীম
কলেজ নম্বর : ১২৫৬৩
শ্রেণি ও শাখা : নবম -ঙ (প্রভাতি)

যার মা নেই তার অক্লান্ত পরিশ্রম যেন বৃথা,
সেই অধম যে শুনে না মায়ের কথা।
যে বেদনা, যে অশ্রু মা নিয়ে ঘুরে কোলে,
সন্তানের সকল সুখেই যেন তার কষ্ট ভোলে।
সন্তান লালন-পালন যে কত কষ্টের তা সকলে জানে না
সন্তানরা বেশির ভাগ সময় তো তা মানেই না
তারা বলে, এতো সবাই পারে
সন্তান লালন-পালনের কষ্ট তাই মার মনে পড়ে বারে বারে
আমার দেশে বৃদ্ধাশ্রমেই হলো মার ঠিকানা
তাই কারো উন্নতি প্রকৃতপক্ষে হয় না
যে মা দিয়েছে সকল কিছু, করেছে নিজের ক্ষতি
শেষ জীবনে এই হয় তার আসল পরিণতি।

রাত্রি একুশ

সিয়াম আহমেদ
কলেজ নম্বর : ৯৬০৩
শ্রেণি ও শাখা : নবম -ঘ (দিবা)

ভোরের শিশির বলছে কথা আজ একুশের দিন,
রক্তে মাখা এই দিনে তাই বাজছে দুঃখের বীন।
পুব আকাশের এক কোণে তাই রক্তে গড়া আভা,
মিশছে এ রঙ সবার মনে বাড়ছে ভাষার শোভা।
বলছে কথা ফুল পাখিরা এই ভাষাতেই আজ,
ওই ভাষাতেই করছি মোরা নিত্যদিনের কাজ।

জোনাকিরা বলছে কথা আঁধার ছায়ায় রাতে,
নানান রকম পাখির কথা ভাসছে মেঘের সাথে।
বলছে কথা ঝোপ-ঝাড়েরাও বাংলা ভাষার মায়ায়,
ঝিঁঝি পোকার গুনগুনানি চলছে রাতের ছায়ায়।
চন্দ্র মায়ায় তাল মিলিয়ে নদীর ঢেউও দোলে,
পুব আকাশে সুয্যি মামা অলস ঘোমটা খোলে।
মাতৃভাষা ভাসছে এখন দিঘির কালো জলে,
কাটছে সাঁতার মনের সুখে পদ্ম পাতার তলে।
মাতৃভাষা ঝড়ছে মনে ফাগুন বৃষ্টি হয়ে,
তাই ভাবছি আমি ক্লান্ত বসে,
রাত্তি একুশ কোলে।

আমি সেই নাগরিক

আশরাফ রহমান
কলেজ নম্বর : ৯৬৮৫
শ্রেণি ও শাখা : নবম -ঘ (দিবা)

আমি সেই নাগরিক
যে কখনো অন্যায়, অত্যাচার, জুলুমকে
প্রশ্রয় করে না।
আমি সেই নাগরিক
যে কখনো অন্যের কষ্ট পাওয়া দেখে
চুপ করে থাকে না।
আমি সেই নগরের নাগরিক
যে বিধ্বস্ত নগরের শেষ প্রান্তে;
আমি দাঁড়িয়ে আছি।
সেখান থেকে শোনা যায়
শুধু লাশের তীব্র দীর্ঘশ্বাস;
শোনা যায় আধমরা কুকুরের
গলাফাটা আর্তচিৎকার।
তাতেই যেন ঘরছাড়া শকুনের
বাঁধ ভাঙ্গা উল্লাস।
আমি দেখতে পাচ্ছি
দগদগে মাটিতে শোষিত রক্তের দাগ
আর হিংস্র হায়নার
রাতভর অতন্দ্র পাহারা।
আমি শুনতে পাচ্ছি
দগ্ধ নগরীর তীব্র হাহাকার।
হায় খোদা! আমি যেন শুনতে পাচ্ছি
বিধ্বস্ত নগরের নাগরিকের কান্না।
আমি অনুভব করতে পারছি
একজন নাগরিক হিসেবে আমার ব্যর্থতা।
আমি বুঝতে পারছি
বিধ্বস্ত নগরের ভবিষ্যৎ অবস্থা।
আমি সেই নাগরিক
যে নগরের দুঃখ নিবারণ করতে না পারায়
ব্যর্থ নাগরিক।

মা

আব্দুল্লাহ আনজুম আদিব
কলেজ নম্বর : ৬৫৩৭
শ্রেণি ও শাখা : নবম -ঙ (দিবা)

ভালোবাসা তোমার ভালোবাসা,
তোমার হাত ধরেই ভুবনেতে আসা।
তোমার সেই শ্রুতিমধুর বুলি,
তাহাতেই ব্যক্ত করি সুখ-দুঃখগুলি।
তোমার স্নেহের নেই কোনো অন্ত,
তুমিই তো ভালোবাসার শেষ প্রান্ত।
মা, আম্মু অথবা মম,
সবই সেই মমত্বের নাম।
মেটানোর নয় এই ভালোবাসা
তা আমি জানি,
তবুও থাকতে চাই তোমার কাছাকাছি,
কারণ আমি তোমাকে বড়ই ভালোবাসি।

বীর শহীদ

মো. ফারহান সাদিক
কলেজ নম্বর : ৯৬০৯
শ্রেণি ও শাখা : নবম -ঙ (দিবা)

পারব না মোরা তোমাদের মতো
করতে মুক্তিযুদ্ধ,
পারব না মোরা তোমাদের মতো
হতে গুলিবিদ্ধ।
পারব না মোরা তোমাদের মতো
নিজের রক্তদ্বারা
দেশের মাটিকে করতে পরিশুদ্ধ।
তবুও
বিজয়ের লগ্নে শুধু এটুকুই বলব
দেশের প্রয়োজনে আমরা হব
যথাসময়েই ক্রুদ্ধ।
ধরব খড়্গ, চালাব কলম
যাব তোমার দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধ।
আমরাই রাখব তোমাদের দেয়া
স্বাধীনতাটাকে অক্ষুণ্ন।
বীর সন্তানেরা
আমরা তোমাদের ছায়ারও নগণ্য
তাই তো আমাদের
শত কোটি সালাম তোমাদের জন্য।

রহস্যময় কিছু

শিহাব খন্দকার
কলেজ নম্বর : ৯৬৭০
শ্রেণি ও শাখা : নবম -ঙ (দিবা)

আঁধার ঘেরা রাতের পরে যাচ্ছে দেখা কিছু,
রহস্যেরই নেশায় পড়ে নিলাম সেটার পিছু।
চারপাশটা কেমন যেন উদ্ভট হয়ে আছে,
মানবকুলের চিহ্নটা নেই চার গোয়েন্দার কাছে।
ঝিঁঝি পোকার ডাকটা শুধু আসছে কানে ভেসে
মন বলছে ঝিঁঝি তো নয়, দৈত্য যেন হাসে!
বাতাস বুঝি সত্যি সত্যি বাড়াবে তার গতি,
ভনি বলে, ও ভাই আরান, কী হবে পরিণতি?
শিবু এবার শক্ত করে ধরল আমায় চেপে,
আরান বোধ হয় বলছে কিছু বায়ুর গতি মেপে।
ভয় পেয়েছ? বলতেই শিবু ভ্যাবডেবে চেয়ে থাকে,
খেঁকশিয়ালের ডাক শোনা যায় এই সময়ের ফাঁকে।
আরান বলে, শোনো সবাই, নেই তো কোনো ভয়
ভয় পাওয়াটা গোয়েন্দাদের স্বভাব মোটেও নয়!
আকাশ বোধ হয় রাগ করেছে, দেখায় তারে কালো
চন্দ্র মামাও আড়াল করে রেখেছে তার আলো।
সব মিলিয়ে পরিবেশটা অন্য রকম লাগে
পরিস্থিতি এমন হলো– কে কার আগে ভাগে!
সাহস বুঝি ফুরিয়ে গেছে, তবুও এগোতে থাকি
জায়গাটাতে পৌঁছাতে আর সামান্যই তো বাকি।
বৃষ্টি নামলো ঠিক তখুনি, বিদ্যুৎও চমকায়!
শিবু বেচারার ভয় দেখে ভনি আবারও ধমকায়।
বৃষ্টিতে ভিজে একাকার হয়ে সামনের দিকে চাই,
আশ্রয় নেব এমন একটা জায়গামাত্র নাই!
কী আর করা, হাঁটছি জোরেই
আস্তে হাঁটলে চলে?
আরান হঠাৎ বলে,
আরে আরে আরে, সামনে তো দ্যাখ, জিনিসটা গেল কই?
শিবু বলে, দেখা যেত যদি আনতি একটা মই!
ধুর ব্যাটা বোকা, কি সব বলিস, মাথায় গোবর আছে!
ভাবি, তোকে নিয়ে কি করে যে গোয়েন্দাগিরি বাঁচে!
হতাশ হয়েই ভনি বলল্যো, আরে ধুর!
ধুর ছাই!
এমন একটা রহস্য যে আবার কবে পাই?
ভনি হয়েছে বড্ড হতাশ, শিবু পেয়েছে ভয়
এই ব্যাটারা গোয়েন্দাগিরি তোদের জন্য নয়!
সব কটাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম শেষমেশ,
শিবু, আরান, ভনি, তর্কাতর্কি ছাড়ো,
জ্বলজ্বল করা জিনিসটা কী ছিলো, ভাবতে কি কেউ পারো?

মৃত্যুঞ্জয়ীর জন্ম

বিজয় সরকার
কলেজ নম্বর : ১৫৪৪২
শ্রেণি ও শাখা : নবম -ঙ (প্রভাতি)

মোর চক্ষে সহে না আর
জাগিয়া ওঠে, যেন ফাটিয়া ফেলি সব নির্বিচার।
ভূ-লোকে, দ্যুলোকে মর্তে পাতালে যখন যেখানে ভ্রমি,
সর্বনাশা কীর্তি মোর জেগে ওঠে পরানে
ভেদিয়া মরমি'
সম্মুখ পানে যাহা পাই,
টুকরো টুকরো করতে চাই।
ঠাকুর দেবতা মোর স্মরণে নাই ॥
হে কিশোর, তোমার রুদ্রর প্রতিটি কোথায়,
নেই কোনো অঙ্গীকার ॥
মাতারে করে অপমান তাও
সম্মুখে তোমার
হৃদয়ে ধারণ কর তুমি
তাঁহাদেরই পবিত্র বাণ।
যে বাণের তেজে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের
ঘটবে উত্থান
হৃদয়ে থাকবে লোহার শক্ত দণ্ড।
নারীর শাঁখা-সিঁদুর হয়ে যাক লণ্ডভণ্ড ॥
আজ তবে অসির আঘাতে ছিন্ন হবে অরাতি
কিশলয় সম নতুন আশা ফুটবে রাতারাতি।
তুমি বীর, তুমি ঝংকার দ্বারা তাড়াও যত
লাজ-লজ্জা-হিংসা শোধ আছে মনে শত শত।
অবরুদ্ধ কারাগার ভেদ করে এগোও দিক-দিগন্তে
মায়ের সম্মান রক্ষা করিতে হইবে যে অন্তে।
যত দীন-দরিদ্র-শীর্ণ-জীর্ণ আছো
নামিয়া পড়ো দিগ্বিদিকে
যতক্ষণে না আসে জয়– লড়াই করিতে থাক ॥
আকিঞ্চন থাকবে তোমার বেদনা বিন্দুর ফাঁকে
হে অসুর, মরবি তুই, পুড়বি পাবকে।
যার তরে এত আক্রোশ
এতো যে লোভ-লালসা প্রাণে
অন্যায় আজ যাক দূরে যাক তেপান্তর পেরিয়ে
কালে কালে মৃত্যুঞ্জয়ী জন্মিবে এই কারণে ॥

ধরণীর সেরা

মোহাম্মদ রাকিবুল হাসান
কলেজ নম্বর : ১২৫৩১
শ্রেণি ও শাখা : নবম -ঙ (দিবা)

বাংলাদেশ বাংলাদেশ
এগিয়ে যাও বাংলাদেশ।
সময় এখনি এগিয়ে যাওয়ার
ছিনিয়ে এনে বিজয়ের গান গাওয়ার।
আমরা বীরের জাতি,
এক সৃষ্টিকর্তাই আমাদের সাথী।
আমরা জয় করি ভয় ভীতি,
আমরা বুঝি না কোনো রীতি,
শুধু গাই বিজয়েরই গীতি।
আমরাই শ্রেষ্ঠ, আমরাই জয়ী,
ভিনদেশি হাত দুশমন হবে পরাজয়ী।
আমাদের আছে সোনার মাটি, সোনার বাংলাদেশ,
এক হয়ে গড়ব আমরা ধরণীর সেরা সেই বাংলাদেশ।

বন্ধু আমরা

আলিফ মো. জাহিন আমান
কলেজ নম্বর : ১২০০৮
শ্রেণি ও শাখা : দশম-গ (প্রভাতি)

বন্ধু আমরা চিরন্তনের
বন্ধু আমরা উদার মনের।
বন্ধু আমরা সন্ধ্যা-ভোরের
বন্ধু আমরা একে অপরের।

করব আমরা লড়ব আমরা,
হারব আমরা জিতব আমরা।
কখনো একা জিতব না আমি
হব আমরা সকলের অন্তর্যামী।
তারার মতো রইব মোরা,
একে অপরের পাশে
একের দুঃখ একের কষ্ট
এক হয়ে আমরা করব বিনষ্ট
যতই আসুক বাধা-বিপত্তি, যতই ভণ্ডামি
গড়ব আমরা এক হয়ে সব সুন্দর আগামী।

বিদায়

মো. জুলকার নাইন (মাহফুজ)
কলেজ নম্বর : ১১৯৭৬
শ্রেণি ও শাখা : দশম-গ (প্রভাতি)

একদিন সবাইকেই বিদায় নিতে হবে।
কেন এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছেন?
কিসের এত তাড়া আপনার?
কতগুলো শূন্য হৃদয়কে বেদনার জলে ভাসিয়ে,
কেনইবা আনন্দিত হচ্ছেন?
আর কখনো শোনা হবে না
আপনার কবিতাগুলো,
মধুময় সেসব কবিতা
হৃদয়কে যা দোলা দিয়ে যেত সর্বক্ষণ।
ভবনের বারান্দা দিয়ে আপনার হেঁটে চলা,
আর দেখা হবে না।
মা, দুঃখ ভারাক্রান্ত এই মনকে
কী করে সান্ত্বনা দেব?
এক বছর, এক মাস কিংবা
আর একটি সপ্তাহের জন্য থেকে যান,
'মা'?

[বি. দ্র. কেরানীগঞ্জের আরা ম্যাডামের বিদায় উপলক্ষে কবিতাটি লেখা হয়েছিল। তাই ম্যাডামকেই কবিতাটি উৎসর্গ করলাম।]

মানুষ দিবস

রাব্বি হাওলাদার
কলেজ নম্বর : ৯৯৮৫
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ -ক (দিবা)

কত শত দিবস আছে এই ধরণী জুড়ে?
শ্রমিক দিবস, নারী দিবস, প্রেম আর ভাষার তরে
একটা দিবস বাদ পড়েছে বছরজুড়ে তাই
প্রশ্ন মোদের কী কারণে-মানুষ দিবস নাই!

মানুষ দিবস কেমন করে উদ্‌যাপিত হতো?
সেই দিনে কি ধর্ম বর্ণ সবাই ভুলে যেত?
জগৎজুড়ে যুদ্ধ থামার উপায় পাওয়া যেত?
জঙ্গিরা সব খুনের নেশা জলাঞ্জলি দিত?
বিশ্বজুড়ে মানুষ কি সব একই খাবার খেত?
মানুষ হয়ে জন্মানোতে সম্মাননা পেত?
কেমন হবে মানুষ দিবস সত্য হয়ে গেলে?
স্বর্গ হতো ধরণী, ভেদাভেদ ভুলে।

নীরবতা

মাহিন দেওয়ান
কলেজ নম্বর : ৮৭৬৪
শ্রেণি ও শাখা : দশম-চ (দিবা)

নীরবতা অনেক শব্দের বার্তা,
নীরবতা প্রকাশ করে অনেক কথা।
নীরবতা রয়েছে প্রতি পলকে,
নীরবতা রয়েছে প্রতিটি আলোর ঝলকে।
গ্রামীণ জীবনের শান্ত নীরবতা;
রাতের শহরের ক্লান্ত নীরবতা;
যুদ্ধের পর আশ্রয়হীন নীরবতা;
দুর্ভিক্ষের পর দুঃখের নীরবতা;
অবশেষে মৃত্যুই ডেকে আনে
চিরকালের নীরবতা।

আমি চাই

ইলিয়াছ সরকার (সিফাত)
কলেজ নম্বর : ১০১৫৯
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ -ক (প্রভাতি)

আমি হারিয়ে যেতে চাই এই গ্রাম বাংলার মাঝে
আমি হারিয়ে যেতে চাই সেই মুসাফিরের বেশে
আমি হারিয়ে যেতে চাই সেই পাখির কলকাকলিতে
আমি হারিয়ে যেতে চাই শিশিরের স্নিগ্ধ ছোঁয়াতে।

আমি বাঁচতে চাই DRMC'র কাকদের সাথে
আমি বেড়ে উঠতে চাই আমার শিক্ষকদের শাসনেরই মাঝে
আমি বেঁচে থাকতে চাই আমার শিক্ষকদের আদর্শকে নিয়ে
আমি মনে রাখতে চাই আমাকে শিখানো নিয়ম শৃঙ্খলাকে।

আমি হাসতে চাই অসহায়, দিনমজুরদের সাথে
আমি দাঁড়াতে চাই আমার দেশের খেটে খাওয়া মানুষের পাশে
আমি বাঁচতে চাই না অহংকারকে প্রতিবেশী করে
আমি চাই অহংকারটাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে।

আমার স্বপ্নের ডিআরএমসি

মো. ওয়াহিদুল ইসলাম
কলেজ নম্বর : ৯৯৯৩
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ -ক (দিবা)

সত্যি তুমি মহান, মহান বিদ্যাপীঠ
বিদ্যা পূজারির জন্যে বিদ্যাতীর্থ স্থান
জ্ঞান পূজারীর জ্ঞানগৃহ তুমি; তুমি
উৎকর্ষ সাধনে অদম্য ও অম্লান।
যেন শ্যামলিমায় ভরা অনন্য নীড়-
শিক্ষা, শৃঙ্খলা, চরিত্র, দেশপ্রেম, সেবা,
দেশগড়ার সুদৃঢ় প্রত্যয়; হেথায়
বিদ্যার্থীদের হাজারো স্বপ্ন করে ভিড়।

কন্টকাকীর্ণ পথকে দলিত মথিত
করে, স্বীয় প্রজ্ঞা ও আত্মবিশ্বাস বলে
উনিশো ষাট থেকে যেভাবে; হ্যাঁ সেভাবে
এগিয়ে যাও হে সেরা, স্বপ্নের কলেজ;
বুকে হাত রেখে বলব তুমি আমার–
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ।

ঠিকানার খোঁজ

মো. সাজেদুল ইসলাম ফাহিম
কলেজ নম্বর : ৯৮১৩
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ -খ (দিবা)

শব্দে নয়, নীরবতা দিয়ে
বেঁধেছি তোমাকে নদী
বালি উপরে মৃতা যদি হও
ভালোবাসা দুরন্ত ধোঁয়াশা
ভরসা কুহক ভেঙে
জেগে উঠতে পারে না, পারে না।
নৈঃশব্দ্যে বন্দনা করি জীবন তোমাকে
মরমিয়তার মধু
তুলে দিই ওষ্ঠ বরাবর,
পান করো, সুস্থ হও
মৃত্যুসম যন্ত্রণা দিয়ো না
অতীন্দ্রিয় আঁধারের ঠিকানা কোথায়
ভালোবাসা কেউ হয়তো ঠিকই খুঁজে পায়....

মাতৃভাষার গান

মো. নিশান
কলেজ নম্বর : ৯৮০৫
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ -ক (দিবা)

বাংলা আমার মায়ের ভাষা
বাংলা আমার গান।
বাংলার আমার মুখের হাসি
বাংলা আমার প্রাণ।
বাংলা ভাষায় স্বপন দেখি
বাংলা আমার ঠিকানা।
বাংলাতে মোর হয় যে মরণ
হয় যেন শেষ বিছানা
বিশ্ব মাঝে বাংলা ভাষার
জয় ধ্বনি আজ শুনি।
বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস
একুশে ফেব্রুয়ারি জানি।
বিশ্ববাসী দিল শেষে
এই দিবসের মান।
তাইতো এসো গাই সবে ভাই
মাতৃভাষার গান।

ভিক্ষা

শেখ শাফায়েত রাফিদ
কলেজ নম্বর : ১০১৫৭
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ -খ (দিবা)

ধূলার সাথে দিয়েছে ঝেড়ে সম্মান ইজ্জত,
ভিক্ষাচক্রে ঘুরছে জীবন খুঁজছে ভবিষ্যৎ।
সন্তান তার জন চারেক করাতে অধ্যয়ন,
ভিক্ষায় প্রাণ করেছে দান ছুঁয়েছে জনচরণ।
পক্ব কেশের ফাঁক দিয়ে দেখেছে জীবনের অন্ধকার,
নিরুপায় হয়ে পথে পথে শুধু ঘুরেছে বারংবার।
জনতার ভিড়ে বলেছে মা একটি দুটি টাকা,
কত লোক দেখে বলেছে ধুর, দিয়েছে পা ঢাকা।
রোজের মতো শব্দ ভান্ডায় দিয়ে দিয়েছে দাঁড়ি,
করুণার দান কুঁড়িয়েছে, এবার ফিরে যেতে হবে বাড়ি।
সারাটা দিন শব্দ ভেঙেছে ক্লান্ত নিথর দেহ,
চরণে লুটানো সমাপ্ত হলো ডাকছে প্রিয় গৃহ।

মায়াবী প্রহর

মো. মাসুদ আলী
কলেজ নম্বর : ৯৭৪৪
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ -গ (দিবা)

শরতের আকাশে এসেছে হেমন্তের মেঘ
সে কি যাবে না কি আসবে ফিরে
নতুন কবিতাগুলো যেন ফের
ফিরে আসে এই স্বপ্নজুড়ে।
তুমি কি জান না কি জান না
নতুন স্বপ্নগুলো হয় মেঘাচ্ছন্ন
আকাশের বুকে জাগা তারা
যেন ভাবে তারা ঘুমে আচ্ছন্ন।
আমি কি নতুনভাবে লিখে যাব
যাতে স্বপ্নকে ভুলে থাকা যায়
স্নিগ্ধ আকাশ, তারা, চন্দ্র আর
মধুর স্বপ্ন ভুলে ফিরে যাব সেই দুনিয়ায়।
আকাশের তারা যেন মিটিমিটি হাসে
চন্দ্র ছড়ায় তারা আলোর ধারা
স্বপ্নের খেলা খেলে আকাশে
স্পর্শের ছোঁয়ায় তৈরি হয় যেন নতুন ছড়া।
কে বলে আকাশের তারা সুন্দর নয়
সুন্দর নয় আকাশের এই স্নিগ্ধ চাঁদ
তাহলে সে কি জানে না নতুন স্বপ্নগুলো তৈরি হয়
এই স্নিগ্ধ তারার পানে চেয়ে স্বপ্নের মাধুরী রাতে।
আছে কি কেউ যে রাত জেগে দেখে
তার গহীন মধুর স্বপ্নগুলো তারার মাঝে
জীবনের আশার পানে চেয়ে
হারিয়ে যায় স্বপ্নের মাধুরী প্রহরে।
জীবনে চলার পথে তাই ভাবি মাঝে
আকাশের তারা হয়ে চিকমিক করি
আর স্বপ্নের গভীর ছোঁয়ায় লিখে যায়
আমার কবিতা এই মায়াবী প্রহর।

কবি হওয়ার প্রয়াস

ঐশ্বর্য ধর অনিক
কলেজ নম্বর : ১০০৬৮
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ -খ (দিবা)

একটা শব্দ হঠাৎ মনে এলো
কবি তাই কলম হাতে নিলো
লিখবে বলে খাতায়
বসে পড়ল সেই খানেতে
বটগাছ আছে যেথায়।
এই যা, শব্দটা যেন কি ছিল?
হঠাৎ মাথা থেকে বের হয়ে কোথায় হারিয়ে গেল?
তাহলে এখন কী হবে?
আজকে যদি না লিখি
কবিতা লিখব আর কবে?
তাহলে কাল দেখা যাবে।
আশা করি শব্দটা কাল নিশ্চয় মনে পড়বে।
কিন্তু এভাবে আর কত দিন?
আজ লিখি, কাল লিখি এই বলে গেল একটি মাস
কথাটি ভেবে কবি ফেলায় উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস।
জমাদানের তারিখ তো বসে আর নেই,
তাই ভাবছি কী করে এখন লেখা জমা দেই,
লিখতে তো চাই অনেক কিছু
কিন্তু কী করব, আমার চিন্তার স্তর তো বেশ নিচু
কিছুই আসে না মাথায়,
তাই তো এখনও লিখতে পারিনি
একটা অক্ষরও খাতায়।

তাই বলে কি দমে যাব?
না হে, এত সহজে হার মানার নই আমি পাত্র
বারংবার চেষ্টা করি,
তাই তো আমি ছাত্র।
লেখালেখির নেই আমার শক্ত পাকা হাত,
আমার লেখা পড়লে লোকের বেরিয়ে আসে দাঁত।
হাসি, ঠাট্টা আর তামাশা করে আমার লেখা নিয়ে
তারপরও আমি লিখতে চাই আমার সেরাটা দিয়ে।

তুমি

আবরার তাসনিম ওয়াছি
কলেজ নম্বর : ৯৮২৪
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ -ঘ (দিবা)

আমি জাতিস্মর নই, তাই বিস্মৃত অতীত,
অতীত হয়েই থাকি।
কিন্তু কেন যেন মনে হয়, আমি চিনি
এই বাঁকা পথ, এই নদী, এই অরণ্য
আর তোমাকে॥
তুমি কবিতা,
যুগ-যুগান্তরের পথে চল একলা
আমি মুগ্ধ পাঠক তোমার।
আর তোমাতেই আমার অতীত
বর্তমানের হাত ধরে এগিয়ে যায়,
সুদূর নক্ষত্রবীথির দিকে॥

পাড়ি

মোহাম্মদ সালাউদ্দিন
কলেজ নম্বর : ১০১৬৮
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ -ঙ (দিবা)

নতুন স্থান, নতুন কাল, নতুন পাত্র।
কেউ ভালো, কেউবা দুধের মাছি মাত্র।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কাঁদে কচি হিয়া;
আসিলাম কোথা? এ কোন দরিয়া!
উঠিনি তরীতে অদ্য, দেখি তরী খেলে,
জলে ভরভর, এই ডুবে বলে।
তবুও সাগর পাড়ি দিতে হবে, হায়!
ভাবছি আসিয়াছি- এ কোন দরিয়ায়।
কাঁদি যত আরো, মিশে নোনা জলে,
আমার সখা সব গেছে উপকূলে।
জাহাজের আশে আমি বসে বারো মাসে,
ধুঁকে মরি ধীরে ধীরে মুক্তি উপবাসে।
আমার ধরিতে হাত কেউ না আসে॥

মা

মো. আবু সাঈদ
কলেজ নম্বর : ৯৭৪১
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ -ঘ (দিবা)

মা কথাটি কতই না মধুর
যত দুঃখ-কষ্ট মাকে দেখে হয়ে যায় দূর
মা কথাটি সত্যিই খুব মধুর
যখন আমরা ছোট ছিলাম
মাকে কাছে পেলে সুখে থাকতাম
আমাদের অসুখ বিসুখ বুঝতাম-
কতই না সুখ
মা দিনরাত করত সেবা
দেখিয়া রেখেছে কেবা
মায়ের এই ঋণ
শোধ হবে না কোনো দিন
থাকবে অমলিন।
মায়ের সেবায় থাকব
সারাক্ষণ
এই আমাদের পণ।

সময়

মো. নাঈমুর রহমান
কলেজ নম্বর : ১৪৯৪৪
শ্রেণি ও শাখা : দ্বাদশ -ক (প্রভাতি)
[হাউসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে লেখা]

পাতাগুলো নড়বে, এভাবেই
এই জানালা দিয়েই তাকিয়ে থাকবে কেউ
অন্য কেউ, আমি না।
সকালের আলো উঁকি মারবে নিয়তই
ঠুকঠুক করবে দরজা এভাবেই
মেজাজ নিয়ে ঘুম ভাঙবে কারোর,
অন্য কারোর, আমার না।
রাতের চাঁদ, অনেক সুন্দর স্নিগ্ধ।
দৃষ্টি কাড়ে মুগ্ধতায়
মন নিয়ে দেখবে কেউ, হয়তো ভাববেও
অন্য কেউ, আমি না।
রাত জাগা পেঁচার মতো,
হয়তো জাগবে কেউ, আমি না।
ভালোবাসাগুলো জড়িয়ে থাকবে চিরকাল,
স্মৃতি হবে সব, পড়ে থাকব আমি।
সময় শুধু যায়, চলে যায়।

গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনী

যমজ কিডন্যাপার

এইচ. এম. খালিদুজ্জামান
কলেজ নম্বর : ১৫১০১৩৩
শ্রেণি ও শাখা : পঞ্চম-খ (প্রভাতি)

অত্যন্ত সৃজনশীল ছেলে আসিফ। উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। ওর আরেকটা গুণ হলো– ও খুব ভালো গান গাইতে পারে। কবিতাও লেখে। একবার হলো কী, পরীক্ষায় এক প্রশ্নে কতগুলো শব্দ দেয়া আছে এবং সেগুলো দিয়ে কবিতা লিখতে হবে। আসিফ এত সুন্দর একটি কবিতা লিখল যে বাংলা স্যার তাকে পাঁচে ছয় দিয়ে দিলেন।

এমন বুদ্ধিমান একটা ছেলে কিনা পড়ল কিডন্যাপারের কবলে!

কোচিং সেন্টার থেকে বেরোতে আজ দেরি হয়ে গেল। বাইরে এসে দেখে তার বাবা নেই। বাবা বলছিলেন, আজ তিনি আসতে পারেন, নাও আসতে পারেন। সে ধরে নিল, বাবা আজ আসবেন না। তাই সে হাঁটা ধরল। ভাড়ার টাকা আছে, কিন্তু সে হেঁটেই যাবে। টাকাটা বাঁচাবে। এ রকম নানান কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল। এমন সময় একটা যুবক আসিফের সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটা দেখতে অবশ্য তেমন ভয়ঙ্কর নয়। বলল, 'তুমি আসিফ না?'

লোকটার হাবভাব মোটেও ভালো লাগছিল না আসিফের।

তবু বলল, 'জি।'

'তোমার বাবা আমার শিক্ষক ছিলেন।'

'কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?'

'আমি তোমাদের বাসায় গিয়েছিলাম। তাই চিনতে পারলাম।' কোথায় কখন এই লোক বাসায় গেছে, সেটা মনে করতে পারল না আসিফ। বলল, 'আমার কাছে কী চান?' 'না মানে....' চোখে চোখে লোকটা কাকে যেন ইশারা করল। তোমার বাবার কাছে একটা জিনিস পৌঁছে দিতে হবে। তারপর হঠাৎ লোকটা আসিফের নাকে একটি রুমাল চেপে ধরল। নিশ্চয়ই ক্লোরোফর্ম। তারপর একটি ভ্যান এল। চার-পাঁচজন মিলে তাকে ভ্যানে উঠিয়ে মুহূর্তেই হাওয়া!

রাত ৮টা বেজে ১৫ মিনিট। আসিফ এখনো বাসায় ফেরেনি। বাবা-মা ও বড় ভাই জিম বুঝতে পারছেন না, কী করবেন। 'কোথায় যে গেল ছেলেটা?' কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন মা। বাবা চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছেন।

চোখ মেলতেই আসিফ দেখল, সে একটি বড় রুমে। মাকড়সার জাল আর ময়লা একটা রুম। একটা পিলারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে। হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। তিনজন লোক ভেতরে ঢুকল। হাতে তেমন কোনো অস্ত্র নেই।

আসিফের মুখে স্কচটেপ লাগানো, কিছু বলতে পারছে না। কেউ একজন আসছে মনে হচ্ছে। এ নিশ্চয়ই লিডার। তারপর যা দেখল, তা তার কল্পনার অতীত। ঘরে ঢুকল সে নিজে অর্থাৎ তার মতো দেখতে একটা ছেলে! হুবুহু এক। লম্বাও সমান। এসেই বলল, 'কী খবর আসিফ?

আসিফ কিছু বলতে চাইল, পারল না।

'অ্যাই, ওর মুখের বাঁধন খোলো', বলল ছেলেটা। আসিফ বলল, 'কে তুমি?'

'আমার নাম বলব না। কিন্তু আজ থেকে আমি তোমার স্থান নিব।'

'মানে?'

'মানে হলো, আমরা তোমাকে সরিয়ে দেব। তোমার জায়গাটা আমি দখল করব।'

'কী? কী বলছ এসব?'

'সত্যি বলছি। আমার পরিবার নেই। আমি তোমার পরিবার দখল করব।'

'না। না, তা তুমি করতে পার না।'

'পারি। অবশ্যই পারি। বাই।'

সে চলে গেল। এবার একটু আগে ফিরে যাই। লোকগুলো ঢোকার আগে আসিফ দেখেছিল কিছু দূরে একটা লাইটার পড়ে আছে। অতি কষ্টে সে যখন ওটার নাগাল পেল, তখনই দরজাটা খুলে গেল এবং তাদের প্রবেশ ঘটল। এই সময়ের মধ্যেই যে লাইটারটা বাগে এনে ফেলেছিল। এর ওটা দিয়ে আসিফ তার বাঁধন খুলে ফেলল। কিন্তু বোকামি করল না। কথা শেষ করার পর যে মুখ বাঁধতে আসছিল তাকে একটা ফ্লাইং কিক মেরে নাক ফাটিয়ে দিল। তার পরই দিল দৌড়। লোকটা ক্রমাগত চিৎকার করছে। চিৎকার শুনে অন্যরা বেরোল। ততক্ষণে আসিফ গেটের বাইরে চলে এল। দারোয়ানটা তাকে ধরার জন্য আসছিল। সে একটা ঘুষি মেরেই তাকে শুইয়ে দিল।

তারপর সে দৌড়!

'এই যে আংকেল, এই জায়গাটার নাম কি?'

'গুলিস্তান।'

'একটা ফোন করতে পারব?'

'অবশ্যই।'

'হ্যালো! হ্যালো আব্বু, আমি আসিফ!'

চাষির আয়-ব্যয়

আকিব রহমান
কলেজ নম্বর : ৭৫৮৮
শ্রেণি ও শাখা : সপ্তম-ক (দিবা)

অনেক অনেক আগের কথা। তখন এক দেশে এক বিরাট রাজ্য ছিল। সেই বিরাট রাজ্যের ছিল বিশাল মনের এক রাজা। সেই দয়াময় রাজার রাজ্যে কোনো দুঃখ-কষ্ট ছিল না। সবখানে ছিল শুধু সুখ আর সুখ।

রাজামশাই তার প্রজাদের অনেক ভালোবাসতেন। প্রজাদের কোনো দুঃখ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাই তিনি মাঝে মাঝে ছদ্মবেশ ধরে রাজ্যে ঘুরতে বেরোতেন প্রজাদের খবর নিতে। এ রকম একদিন রাজামশাই ছদ্মবেশ নিয়ে ঘোড়ায় চেপে বেরিয়েছেন। তার ছদ্মবেশ একজন পাদ্রী বা ধর্মপ্রচারকের। কারণ কেই-বা ভাববে যে একজন রাজা একজন ধর্মপ্রচারকের ছদ্মবেশ নিয়েছেন!

যা হোক, ঘুরতে ঘুরতে তিনি দেখলেন যে চারপাশে সোনালি ধান ফলেছে এবং একটি ধানক্ষেতে একজন চাষি কাজ করছেন। রাজামশাই ঘোড়াটা চাষির সামনে দাঁড় করিয়ে কিছু আলাপ-আলোচনা করেন। কথোপকথনটা এ রকম–

– কি ব্যাপার, ভাই? ভালো আছেন?

– আরে, অবশ্যই! আপনি?

– আমিও ভালো আছি। আপনার তেমন কোনো কষ্ট হয় না তো?

– আরে নাহ! কীসের কষ্ট! আমাদের রাজামশাইয়ের মতো ভালো মানুষ আর কোথাও নেই।

একজন চাষির মুখে নিজের প্রশংসা শুনে রাজামশাই খুব খুশি হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

– তো, আপনার আয় রোজগার কেমন? মানে, দিনে কত টাকা পান?

– সত্যি কথা বলি? দিনে আমি পাই চার টাকা। রাজামশাই তো হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি বলে উঠলেন,

– অ্যাঁ? কী বললেন? চার টাকা?

– জি। চার টাকা।

– আপনি দিন চালান কিভাবে? মানে, এই টাকা কিভাবে খরচ করেন?

– বলছি। আমি এক টাকা খরচ করি, এক টাকা ধার দেই, এক টাকা ঋণ শোধ করি ও এক টাকা কুয়ায় ফেলে দেই। এ কথা শুনে রাজামশাই তো আরো বেশি হতভম্ব হয়ে গেলেন। কী? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী বললেন? এক টাকা খরচ করেন, এক টাকা ধার, ঋণ এসবের মানে কী? আমি তো কিছুই বুঝলাম না!

– বলছি। প্রথম টাকার হিসাব তো বুঝেছেন। দ্বিতীয় টাকা আমি ধার দেই, মানে আমার ছেলেমেয়েকে খাওয়াই। তারা যাতে বড় হয়ে আমাকে খাইয়ে ঋণ শোধ করে। তৃতীয় টাকা দিয়ে আমি ঋণ শোধ করি, মানে আমার বাবা-মাকে খাওয়াই। কারণ তারা আমাকে ছোটবেলায় খাইয়ে ঋণী করেছেন এবং চতুর্থ অর্থাৎ শেষ টাকা কুয়ায় ফেলে দেই বা সঞ্চয় করি। যাতে দরকারের সময় কুয়ার পানির মতো যাতে উঠিয়ে আনতে পারি। কী, বুঝলেন তো?

চাষির উত্তর শুনে রাজামশাই হো হো করে হেসে উঠলেন এবং হাসতে হাসতেই তিনি ছদ্মবেশ সরিয়ে ফেললেন। বেরিয়ে এলো রাজপোশাক ও নিজের আসল চেহারা।

এবার চাষির হতভম্ব হওয়ার পালা। রাজামশাই তখন ঘোড়া থেকে নেমে চাষিকে বললেন, 'তুমি খুবই বুদ্ধিমান। তবে তোমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তুমি আমার মুখ ১০০ বার না দেখা পর্যন্ত এ কথা কাউকে বলবে না।' চাষি বললেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা করলাম রাজামশাই।' তিনি ঘোড়ায় চেপে চাষিকে ১০০ টাকা দিয়ে বললেন, 'এই যে, কিছু টাকা রাখো। এখান থেকে কিছু খরচ করো এবং কিছু কুয়ায় ফেলে দিয়ো।' বলে তিনি হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

পরের দিন রাজসভায় রাজামশাই তার সভাসদদের বললেন যে, একজন লোক (চাষির কথা উল্লেখ না করে) চার টাকা দিয়ে দিন চালায় এবং চাষির ধাঁধাটাও উল্লেখ করলেন। তারপর তিনি বললেন যে, 'এখন আপনারা বলুন তো, লোকটা কীভাবে দিন চালায়? এখন না পারলে কালকে রাজসভায় উত্তর দেবেন।' সভাসদরা তো মাথা চুলকান। এটা কীভাবে হয়? তখন তারা অনেক কষ্ট করে খোঁজ পেয়ে যান যে রাজামশাই গতকাল চাষির সাথে দেখা করেছিলেন।

তারা সবাই সঙ্গে সঙ্গে চাষির বাড়িতে যান এবং অনুরোধ করেন যে চাষি যেন তাদের উত্তরটা বলে দেয়। তখন চাষি সভার সদস্যদের তার প্রতিজ্ঞার কথা খুলে বলল। সভাসদরা তো মহাসমস্যায় পড়লেন। এখন কী তবে রাজার কাছে ছোট হতে হবে? তাদের জন্য চাষির খুব কষ্ট হয়। সে তখন বুদ্ধি খাটিয়ে বলে যে, 'এক কাজ করুন। আপনারা আমাকে রাজার মুখের ছাপ মারা ১০০টি আলাদা আলাদা টাকা দিন।' সভাসদরা কথা মতো কাজ করল। চাষি তখন সবকটা টাকা একবার করে দেখে সভাসদদের উত্তর বলে দিল।

পরের দিন রাজসভায় সবাই রাজামশাইকে সঠিক উত্তর বলে দিল। রাজামশাই প্রথমে তাদের বুদ্ধির প্রশংসা করেন। তবে তাঁর সন্দেহ হয়, আচ্ছা, চাষি এদের বলে দেয়নি তো? রাজসভা তখনই মুলতবি করে তিনি চাষিকে দেখতে গেলেন। মাঠেই চাষির দেখা পেয়ে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, উত্তর সে সভাসদদের বলে দেয়নি তো? চাষি এ কথা স্বীকার করাতে রাজামশাই রেগে যান ও বলেন, 'তোমার এত বড় সাহস যে তুমি আমার প্রতি করা প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেললে?' তবে চাষি মাথা ঠাণ্ডা রেখে রাজামশাইকে বলেন যে, 'কিন্তু আমি তো কোনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিনি!' চাষি রাজাকে সব কিছু খুলে বলে।

সব কিছু শুনে মুহূর্তের মধ্যে রাজামশাইয়ের রাগ উধাও হয়ে যায়। তিনি মনে মনে স্বীকার করেন যে, সত্যিই চাষির বুদ্ধি আছে। তিনি তখনই চাষিকে ৫০০ টাকা দেন এবং তাকে সভার একজন সদস্য করে নেন। চাষিকে এরপর আর হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হয়নি এবং রাজামশাই পেয়ে যান খুবই বুদ্ধিমান একজন সহচর।

অনাসৃষ্টি

রুবাইয়াত বিন হায়দার
কলেজ নম্বর : ৭৪০৮
শ্রেণি ও শাখা : ৭ম-গ (দিবা)

১

অত্যাধুনিক ক্ষমতাসম্পন্ন ভেলকর্ট-১০ একটি নতুন বাসযোগ্য গ্রহের সন্ধানে রয়েছে। এই স্পেশশিপটির ক্যাপ্টেন রিকার্ডো এই মুহূর্তে মন্ত্রমুগ্ধের মতো মহাকাশযানের মনিটরটির দিকে তাকিয়ে আছেন। তার সহকারী ক্যাপ্টেন রিহান বুঝতে পারেন, তার ক্যাপ্টেন মনিটরে অস্বাভাবিক কিছুর উপস্থিতি লক্ষ করেছেন।

- দেখেছ রিহান, একটি নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ৮টি গ্রহ প্রদক্ষিণ করছে। গ্রহগুলোর আকার মাঝারি। ঠিক যেন আমাদের গ্রহ। আমরা আগে এ রকম গ্রহ দেখিনি। হয়তো আমাদের চোখের আড়াল হয়েছে।

ক্যাপ্টেন রিকার্ডোর চোখগুলো একটু উজ্জ্বল দেখায়। যেন এগুলোর কোনটি বাসযোগ্য গ্রহ। তিনি তার সন্ধান পেয়েছেন। গ্রহগুলোকে ভালোভাবে দেখার জন্য মহাকাশযানের মূল প্রসেসরকে তিনি গ্রহের আরো কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

২

নক্ষত্রটির প্রথম দুই গ্রহের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্বের কোনো সম্ভাবনা না থাকায় ক্যাপ্টেন রিকার্ডো অনেকটা হতাশ হয়ে পড়েন। নক্ষত্রটির তৃতীয় গ্রহটিতে যাওয়ার পর তার চোখের উজ্জ্বলতা যেন কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়। কারণ, সেখানে বায়ুমণ্ডল ও পানির অস্তিত্ব মিলেছে। জীবনের প্রথম অনু অ্যামাইনো এসিডও এখানে বিদ্যমান। তবে গ্রহের এলাকাটি কেমন যেন বিধ্বস্ত, নির্জন। তিনি গ্রহটি আরো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন।

- রিহান, অনেকক্ষণ ধরে মহাকাশযান চালাচ্ছি। তবুও কোনো প্রাণের অস্তিত্ব পাচ্ছি না। কোনোভাবেই বুঝতে পারছি না এখানে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব নেই?

- হুমম... হয়তো প্রাণ থাকলেও সেটি আমাদের চোখের আড়াল হয়েছে। না হলে গ্রহের অন্যখানে সেটি পাওয়া যেতে পারে।

ক্যাপ্টেন রিকার্ডো তার অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে তীব্রভাবে গ্রহটি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। হঠাৎই তার চোখ একটি ধাতব যন্ত্রের দিকে আটকে যায়। স্পেশশিপের প্রসেসরকে তিনি ধাতব যন্ত্রটির কাছে অবতরণ করতে বলেন।

৩

কিছুক্ষণ পরে মহাকাশযান ভেলকর্ট-১০ নিরাপদভাবে ধাতব যন্ত্রটির কাছে অবতরণ করে।

- ব্রুক, জোফার!! যাও মহাকাশযানে ঐ ধাতব যন্ত্রটিকে নিয়ে এস।

ব্রুক, জোফার দুইটি ৪ মাত্রার রোবট। এদের বুদ্ধিমত্তা মানুষের চেয়ে একটু কম। এই দুটি রিকার্ডোর অনেক দিনের পুরনো রোবট। রোবটগুলোর প্রতি মায়া জন্মে যাওয়ায় তিনি তাদের ওই নামেই ডাকেন।

কিছু সময় পর ব্রুক ও জোফার ধাতব যন্ত্রটিকে মহাকাশযানে তুলে আনেন।

- রিকার্ডো, এটা অবশ্যই কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর কাজ। তারাই এটি তৈরি করেছে। আচ্ছা, যন্ত্রের লাল বাটনটা কিসের? এখানকার প্রাণীদের কোনো উদ্দেশ্য নেই তো!!

ভয়ার্ত কণ্ঠে রিহানের কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

রিকার্ডো তখনই বাটনটা চাপ দেন। আর মুহূর্তেই কোনো এক ভাষায় চাপা মৃদু কণ্ঠ শোনা যায়। তাদের যেন মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে।

রিকার্ডো তখনই মহাকাশযানের মূল প্রসেসরকে কমিউনিকেশন মডিউল চালু করতে বলেন।

প্রসেসর তখনই ভাষাটি অনুবাদ করতে থাকে।

- 'আমি ভেলার-১: যে গ্রহে আমাকে পাওয়া গেছে, আমি সেই গ্রহের তৈরি শেষ যন্ত্র। গ্রহটির নাম পৃথিবী। এই গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণী ছিল মানুষ। ২১ হাজার ৪৩০ বছর আগে এক ভয়ঙ্কর পারমাণবিক যুদ্ধে সকল মানুষ মারা যায়। কিছু তরুণ এই যুদ্ধ থামাতে চেয়েছিল। কিন্তু পারমাণবিক যুদ্ধের তেজস্ক্রিয়তার ফলে তারাও মৃত্যুবরণ করে। আমি সেই তরুণদেরই তৈরি যন্ত্র।'

যন্ত্রের টেপরেকর্ডারটা এভাবে বারবার বাজতে থাকে। রিকোর্ডো হতাশ এবং করুণার সাথে বলে উঠলেন, '২১ হাজার বছর পূর্বের বাসযোগ্য গ্রহ পৃথিবী আজ তেজস্ক্রিয়তার ফলে থাকার অনুপযোগী। এক পারমাণবিক যুদ্ধ তাদের এই সর্বনাশ ডেকে এনেছে। তাদের বিলুপ্তি যদি এই যুদ্ধের মাধ্যমে না হতো; হয়তো বা আজ আমরা সন্ধান পেতাম এক নতুন বুদ্ধিমান প্রাণীর, যার নাম মানুষ।'

রিকোর্ডোর কণ্ঠরোধ হয়ে এল। কেউ লক্ষ না করলেও রিকোর্ডো বুঝতে পারলেন তার গাল বেয়ে এক শীতল অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়েছে।

বন্ধু

সাদমান সামি
কলেজ নম্বর : ৮৭০৮
শ্রেণি ও শাখা : ৭ম-গ (দিবা)

ছেলেবেলার কথা। আমি, কাব্য, শিশির, পলক আর সৌরভ শীতের শিশিরের কুয়াশায় ঘেরা ছোট্ট মেঠো পথ ধরে হাঁটছি। তখন আমরা পাড়াগাঁয়ের ব্র্যাক স্কুলে পড়তাম। তখন আমাদের খুব ইচ্ছে হতো বড়দের মতো আমরাও পড়ব। অ-তে অজগর, অজগরটি আসছে তেড়ে; আ-তে আম, আমটি আমি খাব পেড়ে......।

আমরা পাঁচ বন্ধু। শিশিরের বাবা নেই। মা-ই তার সব কাজ করেন। স্কুলে আমাদের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল টিফিনের প্রতি। শিশিরের মায়ের আলু ভাজি ও রুটি এবং পলকের মায়ের নতুন পিঠা থাকলেই হতো। ইস! মনে পড়লেই এখনো জিভে জল আসে। তখন তো টিফিন নিয়ে চলে যেতাম। সকলে খেয়েদেয়ে আবার চলে আসতাম।

প্রতিদিনের মতো সে দিনও স্কুলে গিয়েছি। টিফিনের ঘণ্টা দেয়ার সময় শিশির ওর টিফিনবক্স নিয়ে চলে গেল। কোথায় যে গেল খুঁজেই পেলাম না। ছুটির সময় একা হন হন করে চলে গেল। পরদিনও একই কাণ্ড। শিশিরের এই ব্যবহারে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সে দিন মনে হলো আকাশের সমস্ত নীল রং বুঝি অভিমানের মেঘ হয়ে মনের আকাশে জমাট বেঁধেছে। অপেক্ষায় রয়েছে কখন অশ্রুবৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়বে অঝোর ধারায়। আমি জানি না অভিমান কী? তবুও অভিমানী ঝড়ে সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যেতে চাইছে। একা আমি, শূন্যতায় নিস্তব্ধ চারদিক। এ নিস্তবতা ও অভিমান শুধু আমার নয়! সবার, শিশিরের প্রতি। কিন্তু এভাবে কত দিন?

তাই পরদিন ঠিক করলাম শিশিরকে সব কিছু জিজ্ঞেস করব। জানতে চাইব এ রকম আচরণের কারণ কী। কেন ও টিফিনবক্স নিয়ে চলে যায়? কেন যায়? কোথায় যায়? ওকে জিজ্ঞেসও করলাম। কিন্তু উত্তর পেলাম এক নির্বাক চোখের চাহনি। যার ভাষা খুবই জটিল। জানি না, তার মানে কী! পরদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে আমি ও কাব্য মিলে ফন্দি আঁটলাম কীভাবে শিশিরকে ধরা যায়। কত দিন ওর মায়ের রুটি, আলু ভাজি খাই না। তাই সব কিছু পরিকল্পনা করে ঠিক করে নিলাম।

যেই ভাবা সেই কাজ। পরদিন স্কুলে যাওয়ার পর থেকে আঠার মতো শিশিরের পিছনে লেগে থাকলাম। কোনো কাজ হচ্ছে না দেখে পরিকল্পনা পরিবর্তন করে নিলাম। কিন্তু তাতেও কাজ হলো না। যখন আমরা চলে আসতে গেলাম তখনো দেখলাম ওর চোখে শীতল চাহনি। আবারো বুঝলাম না এই শীতল চাহনির মানে কী। যাই হোক, পরে গোপনে তার পিছু নিলাম। দেখলাম শিশির স্কুলের পূর্বদিকের পাহাড়ের মতো ঢালু জায়গায় নিশ্চুপ বসে আছে। টিফিনটাও খুলল না। আমরা এবার ওর সামনে গেলাম। পলক টিফিনবক্স খুলে দেখল। টিফিনে খাবার তো দূরে থাক, খাবারেরও উচ্ছিষ্টও নেই।

আমি খুব হতবাক হলাম। সবাই হলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'কীরে শিশির, এসবের মানে কী?' তখন দেখলাম তার মনের মধ্যে জমে থাকা মেঘ অঝোর ধারায় গড়িয়ে পড়ছে। এক মুহূর্তের মধ্যে বুঝে গেলাম বার বার না বুঝতে পারা সেই শীতল চাহনির মানে কী ছিল।

ভয়ঙ্কর রাত

মো. শফিউর আলম
কলেজ নম্বর : ১২৯৮৬
শ্রেণি ও শাখা : অষ্টম- গ, (প্রভাতি)

সেই রাতটার কথা মনে পড়লে এখনো আমার গা ছমছম করে ওঠে। তখন আমি পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। আমি না, আমরা অর্থাৎ আমরা পাঁচ বন্ধু : আমি, মাহিন, রিদম, আরেফিন, তানজিম ও সাজিদ। অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা শেষে দীর্ঘ ছুটি পেলাম। তখন আমরা এবং স্কুলের শিক্ষকরা ঠিক করলাম যে, আমরা চট্টগ্রামের পাহাড়তলী অঞ্চলে বনভোজনে যাব। যথাসময়ে আমরা চট্টগ্রামের পাহাড়তলী অঞ্চলে পৌঁছলাম। পৌঁছানো মাত্রই সেখানকার এক কর্মকর্তা আমাদের জানালেন, সে অঞ্চলে আছরের নামাজের পরে কেউ যেন ভুলেও 'জলাবন' নামক রাস্তার দিকে না যায়। কারণ, তারপরেই রায়েরবাজার জমিদারদের বাড়ি, সেখানে নাকি অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে এবং সেখানে ভূত-প্রেতের বসবাস। যাই হোক, কর্মকর্তা আমাদের এ ব্যাপারে সচেতন করে আমাদের বনভোজনের স্থানে নিয়ে চললেন। কিন্তু কর্মকর্তার বিবরণ শুনে আমরা পাঁচ বন্ধু (আমি মাহিন, আরেফিন, রিদম, তানজিম ও সাজিদ) আরও উৎসাহী হয়ে উঠলাম। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আজ বিকেলেই জমিদার বাড়িতে আমরা যাব, দেখে আসতে হবে যে সেখানে কী এমন ঘটে যে সে অঞ্চলের জনগণ সেখানে যেতেও ভয় পান।

যথাসময়ে আমরা পাঁচ বন্ধু রওনা হলাম। কাউকে কিছু না জানিয়েই আমরা সেখানের উদ্দেশ্যে চললাম। আমাদের বনভোজন স্থানটি থেকে তিন কিলোমিটার দূরে জায়গাটি। অতএব, সাইকেল ভাড়া করে নিয়ে যেতে আমরা সম্মত হলাম। কিছু সময় পর আমরা জলাবন রাস্তার সম্মুখে এলাম। চারপাশে গভীর বন ও গাছ-গাছালিতে আচ্ছন্ন। তবুও আমরা এগিয়েই চললাম। দুই বড় পুকুরে মাঝের ছোট রাস্তাটি দিয়ে জমিদার বাড়িতে শেষ পর্যন্ত আমরা পৌঁছলাম।

পৌঁছামাত্রই আমাদের মনে হলো– বাড়িটি কেমন অদ্ভুত ও কিছুটা অন্য রকম। কারণ, এর আশপাশে কোনো জনবসতি নেই। যাই হোক, যখন আমরা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করছিলাম তখন মাগরিবের আজান দিচ্ছিল। এদিকে আবার আমাদের সাইকেলের চাকা হঠাৎ পাংচার হয়ে গেল। ঠিক তখনই আকাশজুড়ে কালো ঘন মেঘ থেকে বৃষ্টি শুরু হলো। আমরা ভাবলাম এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। কারণ, সাজিদ সাইকেল ভাড়া করার সময় সাইকেলের চাকায় পাম্প আছে কিনা তা চেক করেছে। তখন তানজিম বলল, যেহেতু সাইকেল করে যাওয়া সম্ভব নয়, উপরন্তু বাইরে প্রচুর বৃষ্টি, আজ রাত এখানেই কাটাই। কাল সকালে দেখা যাবে কী করা যায়। আমরা সকলে থাকতে সম্মত হলাম।

বারান্দা দিয়ে যেইমাত্র দরজা খুললাম তখনই ভিতর থেকে সারি সারি বাঁদুড় বেরুল। আমরা সকলে ভয় পেয়ে গেলাম। ভেতরে ঢোকার পর দেখলাম বাড়িটি বেশ বড় এবং দেখতে ভয়ঙ্কর। হঠাৎ ভিতরের ঘর থেকে বিড়ালের মিউ মিউ ডাক শোনা গেল। তখন সবাই ভয় পেয়ে গেলাম। এই নির্জন ঘরে বিড়াল কোথা থেকে এলো? যেইমাত্র ব্যাপারটা দেখতে আমরা ঘরে প্রবেশ করলাম বিড়াল তো নেই বরং ডাকও আর শোনা গেল না। আবার উপরের ঘর থেকে আসছে নানান ধরনের শব্দ। মনে হচ্ছে কয়েকজন পুরুষ-মহিলা মিলে আড্ডা দিচ্ছে, নাস্তা করছে এবং টিভি দেখারও শব্দ শোনা যাচ্ছে। এসব শুনে আমরা হতভম্ব ও শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম কী করে এ সম্ভব, কোনো লোককেই তো দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ বাইরে তীব্র বেগে মেঘ ডেকে কাছে কোথাও বাজ পড়ায় বাড়ির বিদ্যুৎ চলে গেছে। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। রিদম পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করে কোনো মতে আলো জ্বালালো। তখন এশার আজান দিচ্ছিল। আমরা সকলে একটি জায়গা বেছে নিয়ে নামাজ আদায় করে নিলাম। পরে সকলে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ি। এর এক-দুই ঘণ্টা পর এক দৌড়ের শব্দে সবার আগে ঘুম ভাঙে আরেফিনের। তারপর সে আমাদের জাগিয়ে দেয়। আমরা শুনলাম যে, কোনো এক নারী প্রাণের ভয়ে ছুটছে। বিষয়টা দেখার জন্য আরেফিন বারান্দার দিকে যেই মুখ দিল, অমনি এক বীভৎস এবং ভয়াল আকৃতির চেহারার এক নারী তার সামনে উপস্থিত হয়ে তার বিশাল দাঁত বের করে হাসতে লাগল। তাকে দেখে ভয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় আরেফিন এক চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ঘড়িতে তখন ১১টা। ভয়ে আমরাও আরেফিনকে কাঁধে করে সবচেয়ে ভিতরের ঘরের দিকে দৌড়ানো শুরু করলাম। দৌড়ানোর সময় কিসের মধ্যে পিছলে আমরা পড়ে গেলাম। পর্যবেক্ষণ করলে দেখি সেগুলো রক্ত। রক্তের উপর আমরা পড়ে আছি। তখন সবাই যা দেখল এবং শুনল তাতে কেউই আর এক মুহূর্তও থাকতে পারল না। দেখলাম যে, সে ভয়াল চেহারার মহিলাটি আমাদের দিকে ছুরি হাতে দৌড়ে আসছে। আমরা ভয়ে রক্ত মাখামাখি অবস্থায় দৌড়ানো শুরু করি। দৌড়ানোর সময় আমরা পুরো করিডোরজুড়ে শুধু মহিলাদের কান্না-হাসির আওয়াজ শুনছিলাম। হঠাৎ আমরা দেখি যে বাড়ির বাইরে সারি সারি আম গাছের প্রতিটিতে একটি করে পুরুষের মৃতদেহ ঝুলানো। তখন সকলে ভয়ে আল্লাহ্! আল্লাহ্! বলা ছাড়া আর কোনো উপায় পেলাম না। এতে কিছুটা ভয় কমে এলেও পরক্ষণে বাড়ির ভিতরের ঘর থেকে মহিলাদের একবার কান্না, একবার হাসির শব্দ তীব্র গতি লাভ করে। আবার আমগাছগুলো থেকে একে একে মৃতদেহগুলোর দড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাটিতে পড়া শুরু করে। দ্বিতীয়ত, সেই ভয়াল চেহারার মহিলাটি আরো বেশ কয়েকজন পুরুষ-মহিলা নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। পুরুষ-মহিলারাও মহিলাটির মতো ভয়াল এবং বীভৎস। সকলে হাসতে হাসতে আমাদের দিকে তেড়ে আসছিল। তাদের কারো একটি চোখ নেই, কারো পা নেই, আবার শরীরেও ক্ষত-বিক্ষত চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

এক পর্যায়ে ব্যাপারটি গুরুতর হলে আমরা কিছু না ভেবেই পিছনের ঘরটিতে পালালাম এবং আল্লাহ! আল্লাহ! বলতে থাকি, বিভিন্ন সূরা-তাসবিহ পাঠ করতে থাকি। ঘড়ির কাঁটায় তখন ভোর ৪টা। বেশ খানিকক্ষণ পরে আরেফিনের জ্ঞান ফিরল। আবার কিছুক্ষণ পর ফজরের আজান দিলে আমরা আর কোনো আওয়াজ শুনতে পেলাম না, কাউকে আর দেখা গেল না। তখন আমি অবস্থা ভালো মনে না করে বলি, বাইরে যতই বৃষ্টি থাকুক, আমাদের ক্যাম্পে ফিরে যেতে হবেই। তখন সকলে আমার কথায় সায় দিল।

সকলে তাড়াতাড়ি বারান্দায় সাইকেলের কাছে গেলাম। হঠাৎ সাইকেলের চাকার পাম্প ভর্তি দেখে সবাই অবাক হলাম। কিন্তু তখনই আবার সে ভয়াল আকৃতির মহিলাটি আমাদের দিকে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তেড়ে আসছিল। আমরা ভয়ে এবং নিজেদের সামলাতে না পেরে বৃষ্টিতেই সাইকেলে করে পালালাম।

ক্যাম্পে ফেরার পর সকলকে ঘটনাটি জানাই। সকলে আমাদের ঘটনায় কিছুটা শঙ্কায় পড়লেও ঐ কর্মকর্তা এবং শিক্ষক আমাদের বকাবকি করেন। ঠিক সে দিন সকালেই আমরা ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা দিই। কিন্তু ফিরে আসার পর আরেফিন-রিদম এক সপ্তাহ ধরে জ্বরে আক্রান্ত ছিল। আমাদের বাকি তিনজনের অবস্থাও ভালো ছিল না। পরে ইন্টারনেট থেকে আমরা জানতে পারি, ঐ বাড়িটি ইংরেজদের আমলের। তখনকার ইংরেজদের একটি দাবি না মানায় তারা বাড়িটির মহিলাদের নির্যাতন করে একটি ঘরে বন্ধ করে পুড়িয়ে মারে এবং পুরুষদের গাছের সঙ্গে ফাঁসি দিয়ে মারে। তারপর ঐ জায়গাটিতে আর কোনো দিন কেউ যাওয়ার চিন্তাও করিনি।

অচিন বাংলো

মো. আরাফাত ইসলাম
কলেজ নম্বর : ১২৯৯২
শ্রেণি ও শাখা : অষ্টম- গ (প্রভাতি)

কদিন হলো পরীক্ষা শেষ হয়েছে দীরুর। এখন হাতে রয়েছে প্রচুর সময়। দীরুর একটি শখ হলো বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাওয়া। আর বন্ধের সময় ঘুরতে যাওয়া একটি সাধারণ চিন্তা। তাই সে ঠিক করল সিলেট যাবে। সে তার দুই বন্ধু শাহীর ও ইমনকে নিয়ে সিলেট ভ্রমণের চুক্তি পাকা করে ফেলল। তাদের পরিবারের তেমন কোনো আপত্তি ছিল না, তাই তারা তৈরি হয়ে নিল সিলেট ভ্রমণের জন্য। দিনটি ছিল ২১/ ১২/ ২০১৫। দীরু ও তার দুই বন্ধু ইমন ও শাহীর পৌঁছে গেল কমলাপুর স্টেশনে। চারদিকে প্রচুর লোকের কোলাহল। ট্রেন থেকে লোকদের নামতে দেরি হলেও সেখানে কুলিদের হাজির হতে সময় লাগত না। বেঁচে থাকার জন্য লোকজন কত কিছুই না করে। এমন এলোমেলো ভাবনা ভাবতে ভাবতে ট্রেন এসে হাজির হলো। লোকজনের হাঁকডাক যেন আরো বেড়ে উঠল। দীরু, ইমন ও শাহীর তাদের মালামাল বুকে নিয়ে ট্রেনে তাদের স্থান বেছে নিল। আশপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে তাদের যাত্রাটা ভালোই কাটল। দীর্ঘ ৫ ঘণ্টা পর তারা পৌঁছল সিলেট শহরে। তখন অনেকটা অন্ধকার হয়ে গেছে। তাদের যাত্রা এখনো শেষ হয়নি সিলেট শহর থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে লাক্কাতুরা চা বাগান। এখানকার অনেকের ইমনের বাবার সাথে পরিচয় ছিল তাই তারা নিজেদের মনের মতো লাক্কাতুরার ভেতরে একটি বাংলো পেল। একজন গার্ডও ছিল, যে এই বাংলো দেখাশুনা করেন। লোকটির নাম আছির মিয়া। বয়স চল্লিশের মতো। তিনি আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দিলেন। দীরু ও তার দুই বন্ধু ফ্রেশ হয়ে খেয়ে ঘুমাতে গেল।

খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা দীরুর অভ্যাস। ইমন ও শাহীর ঘুমালেও সে সকাল বেলা পরিপাটি হয়ে বের হয়ে গেল বাইরের প্রকৃতি দেখার জন্য। চারদিকে কুয়াশা, চা বাগান ইত্যাদির দৃশ্য যেন দীরুর মনকে আরো সতেজ করে তুলেছিল। কয়েক মাইল হাঁটার পর চা বাগানের আরো গভীরে দীরুর নজর কাড়ল আরেকটি বাংলো। তার মনে প্রশ্ন জাগল, এত গভীরে বাংলো তৈরি করে কে থাকে? ভেতরের যাওয়ার পরিকল্পনা করলেও পরিকল্পনা ত্যাগ করে সে ফিরে আসে নিজ বাংলোতে। ইতোমধ্যে আছির মিয়া সকালের নাস্তার ব্যবস্থা করে ফেলল। নাস্তা করে তিন বন্ধু বেরিয়ে গেল চা বাগানের পরিবেশ উপভোগ করার জন্য। কিন্তু দীরুর মন থেকে যেন কিছুতেই মোছা গেল না তার দেখা বাগানের গভীরে সেই বাংলোর কথা। সাড়ে ৪টা বাজে। প্রায় সন্ধ্যার মতো হয়ে গেছে। চারদিকে কুয়াশা ও তীব্র ঠান্ডা। আছির মিয়া তাদের তিনজনের জন্য গরম চা তৈরি করেছে। দীরু আছির মিয়াকে তাদের সাথে বসতে বলল। গল্পের আসরের মতো বসল তারা। দীরু আছির মিয়ার সাথে তার কথোপকথন শুরু করল :

দীরু : চাচা আপনি এই বাংলো দেখাশোনা করেন কত বছর?
আছির মিয়া : মোর বয়স তো প্রায় ৪০ বছর বাজান। মুই প্রায় ২৫ বছর এই বাংলোর দেখাশুনা করতাছি।
দীরু : চাচা আমি আপনাকে ঠিক কয়েক মাইল দূরে এই চা বাগানের গভীরে আরেকটি বাংলো সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম।
আছির মিয়া : বুঝতে পারিছি। আল্লে 'অচিন বাংলোর' কথা জানতে চাচ্ছেন।
শাহীর ও ইমন চমকে বলে উঠল, 'অচীন বাংলোর' এ কেমন নাম!
দীরু : আচ্ছা চাচা, আপনি কি কিছু বলতে পারবেন ঐ বাংলো সম্পর্কে।

আছির মিয়া : বাবু, মুই খালি এই বাংলোর দেখাশুনা করি না, মাঝেমধ্যে ঐ বাংলোরও দেখাশুনা করি। ঐ বাংলোর মধ্যে একজন লোক থাকেন। নাম উপেন্দ্র বাবু। তিনি একাই থাকেন ঐ বাংলোতে, মাঝমধ্যে কার লগে জানি কথা কয়।

শাহীর ও ইমন ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'ঐ বাংলোতে ভূত থাকে নাকি? এটি আবার ভূতের ছবির মতো কাহিনী না তো? দীরু তাদের সান্ত্বনা দিয়ে শাহীর ও ইমনকে বলল, কালকে আমরা সেই বাংলোতে যাব। কিন্তু দীরুর প্রস্তাবে রাজি হলো না ইমন ও শাহীর। দীরুও বলে দিল, না হলে আমি একা যাব। দীরুকে একা ছাড়তে চায় না তারা। তাই তার প্রস্তাবে রাজি হলো। পরের দিন তারা রওনা হলো 'অচিন বাংলো'র উদ্দেশ্যে। বাংলোটা পুরনো ছিল। দোতলা ছিল বাংলোটি। নিচের অর্থাৎ ঘরে ঢোকার দরজাটি খোলাই ছিল। দীরুর মনে ভয় না থাকলেও ভয় ছিল ইমন ও শাহীর মনে। ভেতরেও কারো সাড়া-শব্দ না পেয়ে উপরে উঠল তারা। বারান্দা দিয়ে হাঁটার সময় হঠাৎ একজন লোক বলে উঠল, 'ভিতরে এসো দীরু'। তারা তিনজনই ভয় পেয়েছিল। কিন্তু তারা তাদের ভয়কে দূরে সরিয়ে ভিতরে ঢুকল। পরিচয় হলো এক ৭২ বছর বয়সী বুড়ো লোক অর্থাৎ উপেন্দ্র বাবুর সাথে।

দীরু : আপনি আমার নাম জানেন কী করে?
উপেন্দ্র বাবু : আছিরের কাছ থেকে শুনেছি।
ইমন : আপনি এই বাংলোতে একা থাকেন?
উপেন্দ্র বাবু : হ্যাঁ।
দীরু : কেন? আপনার কেউ নেই? আপনি বিবাহ করেননি?
উপেন্দ্র বাবু : করেছিলাম। আমার একটি ছেলেও আছে। এখন কে কোথায় থাকে কিছুই জানি না।

দীরু : এই বাংলোতে একা থাকেন কীভাবে?
উপেন্দ্র বাবু : আমি তো একা নই। এখানে অনেকে আছে যারা আমার সাথে প্রতিনিয়ত কথা বলে।
তার আজগুবি কথা শুনে ভয় পায় দীরু, ইমন ও শাহীর। কিছুক্ষণ পর সিগারেট ধরায় লোকটি।
শাহীর : আপনি সিগারেট খান?
উপেন্দ্র বাবু : দেখতেই তো পারছ।
শাহীর : আপনি বোধহয় এর থেকে বড় নেশায়ও আসক্ত। কারণ, এই বাংলোতে আমি কিছু মদের বোতলও দেখেছি।

হঠাৎ করে উপেন্দ্র বাবুর মন কেমন জানি হয়ে গেল এবং তাদের বাংলো থেকে চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। তারা তিনজনও সেই বাংলো থেকে বেরিয়ে এল লোকটি সম্পর্কে জানার জন্য দীরুর ইচ্ছার কোনো শেষ নেই। তাই তার সম্পর্কে কিছু তথ্য জানার জন্য সে আছির চাচাকে প্রশ্ন করে। আছির চাচা তার বক্তব্য শুরু করেন।

'আমি এই বাংলোর দায়িত্ব পাওয়ার আগে তারা থাকত এখানে। লোকটির সম্পত্তি কম নেই। তাও সে তার প্রিয় এই বাংলোতে থাকত। তার স্ত্রী ও এক ছেলে ছিল। এই বাংলোতে থাকা নিয়ে তাদের আপত্তি ছিল। তাদের অনুরোধেও লোকটি এই বাংলো ছাড়ল না। লোকটি প্রচুর নেশা করত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাকে একা ফেলে রেখে তার স্ত্রী ও ছেলে চলে যায়। আজ পর্যন্ত কেউ তার সাথে দেখা করতে আসেনি।'

দেখতে দেখতে অনেক দিন হয়ে গেল। এখন ফেরার পালা। এতদিন অচিন বাংলোর কোনো খোঁজ নেয়নি দীরু। যাওয়ার আগে হঠাৎ তার আবার খুব ইচ্ছে হলো উপেন্দ্র বাবুর সাথে সাক্ষাৎ করবার। যাওয়ার দিন সকাল সকাল বেরিয়ে গেল সে। পৌঁছল অচিন বাংলোতে। উপেন্দ্র বাবু নিচেই বসেছিল। দীরুর উপস্থিতিতে খুশি হলো সে। দীরু বুঝতে পারল, সে দিনের উপেন্দ্র বাবুর চেয়ে আজকের উপেন্দ্র বাবুর আচরণে অনেক তফাত। আজকের মানুষটা অনেক সাদামাটা।

দীরু : কেমন আছেন? শরীরের কী অবস্থা?
উপেন্দ্র বাবু : যেমন চলার দরকার তেমনি চলছে।
দীরু : আমরা আজকে চলে যাচ্ছি।
উপেন্দ্র বাবু : জানি।
দীরু : কিছু প্রশ্ন করব, যদি কিছু না মনে করেন।
উপেন্দ্র বাবু : অবশ্যই।
দীরু : আপনার পরিবারের কথা আপনার মনে হয় না?

উপেন্দ্র বাবু : হয়! মনে পড়ে। কিন্তু নেশার জগতের কাছে হার মেনেছে সব কিছু।
দীরু : আপনার তো অনেক কিছুই আছে। আপনার সুখ নেই কেন?

উপেন্দ্র বাবু : কে বলেছে আমার সুখ নেই। আমার স্ত্রী ও ছেলে আমার সাথে প্রতিদিন কথা বলে। কিছুক্ষণ পর তারাও আসবে। তুমি আসার আগে তারা আমার সাথে কথা বলছিল।

দীরু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উপেন্দ্র বাবুকে বিদায় দিয়ে ত্যাগ করল অচিন বাংলো। বের হওয়ার পর অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল উপেন্দ্র বাবুর দিকে।

ট্রেন এসে পড়েছে। দীর্ঘ সময় কাটিয়ে এখন সিলেটকে বিদায় দেয়ার পালা। আছির চাচাকে বিদায় দিয়ে ট্রেনে উঠল তারা। তখন ইমন দীরুকে বলল, 'লোকটার সম্পর্কে কী জানলি রে? কেউ তো থাকে না সে বাসায়। তিনি কার সাথে কথা বলেন?' একই প্রশ্ন শাহীরের।

দীরু হালকা হেসে বলতে শুরু করল দুনিয়ার জীবন বৈচিত্র্যময়। মানুষ নিজের সুখের জন্য বিপদও ডেকে আনে। যেমন উপেন্দ্র বাবু করেছেন।

ইমন ও শাহীর হতবাক হয়। দীরু আবার বলতে লাগল।

'সমাজে মানুষ তার সকল ইচ্ছা পূরণের জন্য অনেক কিছু করে যায়। যারা তাদের ইচ্ছা সব পূরণ করে দুনিয়াতে আর কোনো কিছু পাওয়ার আশা রাখে না তখন তারা নেশাকে গ্রহণ করে। যেমন উপেন্দ্র বাবু করেছে। তার স্ত্রী ও পুত্র তাকে রেখে চলে যাওয়ার প্রধান একটি কারণ হলো এই নেশা।

'তাহলে সে এই বাংলোতে এত কষ্ট নিয়ে থাকে কীভাবে?' ইমনের প্রশ্ন।
'তার কোনো কষ্ট নেই। সে নেশাকে তার সুখ হিসেবে গ্রহণ করেছে। সে অনেকের সাথে কথা বলে। আসলে সে কথা বলে তার বানানো কিছু অদৃশ্য মানুষের সাথে, যাদেরকে বানাতে সহায়তা করে তার নেশা। নেশার মাধ্যমে সে তার মনে জাগিয়ে তোলে তার ছেলে ও স্ত্রীকে এবং কাল্পনিকভাবে আজও বেঁচে আছে সেই বাংলোতে। সে হয়তো বা জানে, সে তার কতটা ক্ষতি করছে। কিন্তু একটু সুখের জন্য সে সকল ক্ষতি মেনে নিচ্ছে। সে তার জীবনকে ত্যাগ করছে একটু সুখের জন্য।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দীরু বলতে লাগল,

'নেশা বড় খারাপ জিনিস। মানুষ এই জিনিসটাকে সুখ হিসেবে ধরে নিলেও তারা জানে না, তারা তাদের কত বড় ক্ষতি করছে। তারা তাদের নিজেদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। যেমনটা করছে উপেন্দ্র বাবু। নেশার মাধ্যমে মনের জগতে তার বউ ও ছেলেকে জাগিয়ে তুলে আজও বেঁচে আছে সে অচিন বাংলোতে। এটাই তার সুখ।'

দীরুর কথা শুনে ইমন ও শাহীরও যেন ভেসে গেলে দুঃখময় কল্পনার রাজ্যে। মানুষ নিজের সুখের জন্য কী না করতে পারে। এত বড় বিপদকেও তারা সুখ হিসেবে বেছে নেয়।

Moral : Say No To Drugs.

অসমাপ্ততার গল্প

তাহমিদ হাসান
কলেজ নম্বর : ৬৮৯৪
শ্রেণি ও শাখা : অষ্টম-খ (দিবা)

টিফিনের টাকাগুলো কখনোই বাজে খরচ করত না সে। টাকা জমানোর অভ্যেসটা তার পুরনো। তাই তো তার সবচেয়ে পুরনো বইয়ের পাতা উল্টালে এখনো ৩টি ৫০০ টাকার নোট খুঁজে পাওয়া যাবে। এত দিনে হয়তো গল্পটা মলিন হয়ে গেছে। তার বইয়ের শেলফটির অগোছালো রূপটির কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটেনি। তার জিনিসিপত্রগুলো ঠিক আগের সাজেই সাজানো রয়েছে।

বন্ধু মহলের হাসির রাজা বলেই গণ্য হতো সে। হাসিমুখ ছাড়া তার মুখ আমি খুব কম দেখেছি। খুব বলতে খুব। তবে হ্যাঁ, একদিন তাকে গম্ভীর অবস্থায় দেখেছিলাম। বেশ অধীর আগ্রহ নিয়ে কারন জিজ্ঞাসা করায় উত্তরটা কিছুটা এমন পেয়েছিলাম, 'এই জীবনের পথটা সুদীর্ঘ, জানি না ঠিক মতো পাড়ি দিতে পারব কি না।' কথাটা বলার পর মুহূর্তেই আবার সেই চিরচেনা হাসিটা বাসা বেঁধে নিল তার মলিন চেহারায়।

আমাদের মাঝে সব কিছুই বলা হতো। লুকানো থাকত না কিছুই। কিন্তু একটি কথা সে লুকিয়েছিল, লুকিয়েছিল সে আমাদের সবার কাছ থেকে। আর সেই বড় সত্যটা হলো তার ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া।

আজ তার সেই বইগুলো রয়েছে। বইয়ের পাতার ভেতরে লুকানো টাকাগুলো ঠিক আগের নিয়মেই রয়েছে। অগোছালো শেলফটিও কোনো নিয়ম ভঙ্গ করেনি। সবার জীবন আবার আগের মতোই চলা শুরু করেছে। খালি এসবের মাঝে অনুপস্থিত ছিলে সে। আজও ক্লাসের ফাঁকে অট্টহাসির রোল পড়ে যায়। কিন্তু সেই হাসিটার মাঝে কোথায় যেন এক অভাব আমরা প্রতিনিয়ত খুঁজে পাই।

শেষ দিনের অনুমানটা বেশ ভালো করেই লাগিয়েছিল সে। তাই তো সব কাছের মানুষদের বাড়ি থেকে নামিয়ে বলেছিল, 'কোনো ভুল করে থাকলে মাফ করে দিস আর ভালো থাকিস। শুভবাই বন্ধু। আল্লাহ হাফেজ।' সবাইকে জড়িয়ে ধরে কথাগুলো বলেছিল সে। আমাকেও ঠিক এভাবেই বলেছিল। অত্যধিক স্বাভাবিক রূপেই কথাগুলো ব্যক্ত করেছিল সে। কাউকে কিছু বুঝতে দেয়নি। সাধারণত বিদায় বেলায় সে 'আল্লাহ হাফেজ' বাদে কিছুই বলত না। কিন্তু সে দিন সবাই তার মুখে 'শুভবাই' বলা বিয়োগব্যথা অনুভব করেছিল।

সবাইকে ধোঁকা দিয়েছিল সে।

মনে পড়ে তাকে খুব মনে পড়ে।

এখনো মাঝেমধ্যে আমাদের সর্বকালের আড্ডার স্থান সেই চায়ের দোকানে গেলে মুখ ফসকে বেরিয়ে আসে, 'মামা কড়া লিকারে একটা লাল চা আরেকটা দুধ চা দিও।' পরক্ষণেই আবার সংশোধন করে বলতে হয়, 'না মামা একটা দুধ চা দিলেই হবে।' মাঝেমধ্যে মামাও প্রশ্ন করে বসে, 'তোমার সেই বন্ধুটা কই? অনেক দিন দেখি না।' আমি মুচকি হেসে বলি, 'আছে মামা, আমার পাশেই বসে আছে। তুমি চা টা দাও।'

মামাকে তো ব্যবসা চালাতে হবে তাই এত পাত্তা না দিয়ে কাজে লেগে পড়ে।

আজ বেশ সকাল সকাল গোসল করে চলে গেলাম মামার সেই চায়ের দোকানে। আজ আর লাল চায়ের অর্ডারটা বাতিল করলাম না। খুব মনে পড়ে তার কথা। আজ তো বিয়োগব্যথা আরো তীব্র। কারণ, আজ তার হয় মৃত্যুবার্ষিকী। ও প্রতিদিন আসে আমার কাছে। ওর কথা মনে পড়লে আমি সেই চায়ের দোকানে গিয়ে বসে থাকি। সেখানেই অনেক কাছে ফিরে পাই সেই চিরতরে হারিয়ে যাওয়া শরীরটিকে। মাঝে মাঝে খুব রাগ হয় ওর উপর। কেন সে আগে জানালো না? কী ক্ষতি হতো জানালে? এ রকম নানান প্রশ্নের ভান্ডার নিয়ে বসি নালিশ জানাতে। কিন্তু ওপার থেকে কোনো উত্তর আসে না। এই জীবনে তো সবাইকেই চলে যেতে হবে। এত এক পরীক্ষার হল-ই বটে।

আগে জানালে হয়তো আরো বেশি ভালোবাসতে পারতাম, আরো বেশি অধিকার দিতে পারতাম। জড়িয়ে ধরে বলতে পারতাম–

'তুই তো আগে পরীক্ষার হল থেকে বের হবি, অপেক্ষা করিস বন্ধু, আমরাও পরীক্ষা শেষ করে জলদি আসছি।'

মোবাইলে স্বাস্থ্যসেবা

নিয়ামত আলী (রাসেল)
কলেজ নম্বর : ৭০৪৫
শ্রেণি ও শাখা : অষ্টম-খ (দিবা)

মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্যসেবা পেতে চেরাগ আলী রেজিস্ট্রেশন করেছেন। হঠাৎ বুকে ব্যথা বোধ করায় তিনি চিকিৎসকের কাছে ফোন করলেন।
–চিকিৎসক : আপনি কোন ভাষায় কথা বলতে চান? বাংলা হলে ১ চাপুন, ইংরেজি হলে ২ চাপুন, চায়নিজ হলে ....
–চেরাগ আলী : ভাই বাংলা, বাংলা-১, ১ আমার বুকে ব্যথা।
–চিকিৎসক : ওয়েল! বুকের বা পাশে ব্যথা হলে ১ চাপুন আর ডান পাশে হলে ২ চাপুন।
–চেরাগ আলী : ভাই, মরে গেলাম। কী করব তাড়াতাড়ি বলুন।
–চিকিৎসক : ব্যথা কখন থেকে? সকাল থেকে হলে ৬ চাপুন, দুপুর থেকে হলে ৭ চাপুন আর সন্ধ্যায় হলে ....
–চেরাগ আলী : একটু আগে, বেশি ব্যথা, তাড়াতাড়ি ওষুধের কথা বলুন।
–চিকিৎসক : আপনার পরিবারে কোনো সদস্যের বুকে ব্যথা হয়? দাদার হলে ৩ চাপুন, জ্যাঠাতো ভাইয়ের হলে ৪ চাপুন আর দুলাভাইয়ে হলে...
–চেরাগ আলী : আহ! উহ!
–চিকিৎসক : হ্যালো! হ্যালো! কথা বলছেন না কেন? অজ্ঞান হলে ১ চাপুন আর মরে গেলে ২ চাপুন।
–ভাই : হ্যালো আমার ভাই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।
–চিকিৎসক : ওহ্ হো। উনার মনে হয় হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তাড়াতাড়ি কোনো হাসপাতালে নিয়ে যান।
–ভাই : অ্যাম্বুলেন্স প্রয়োজন। কোনো একটি হাসপাতালের ফোন নম্বর দিন।
–চিকিৎসক : দুঃখিত। হাসপাতাল ও অ্যাম্বুলেন্স সংক্রান্ত তথ্য জানতে আপনাকে পুনরায় রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।
রেজিস্ট্রেশনের জন্য টাইপ করুন Hostp আর sent করুন ৯৬৯৬ নম্বরে।
–অপারেটর : হাসপাতালের তথ্য সেবায় আপনাকে স্বাগতম। আপনি ধন্যবাদ দিতে চাইলে ১ চাপুন, কোনো পরামর্শ চাইলে ২ চাপুন।
–ভাই : অ্যাম্বুলেন্স লাগবে ভাই। তাড়াতাড়ি একটি অ্যাম্বুলেন্স পাঠান।
–অপারেটর : আপনি কান্দিরপাড় এলাকার বাসিন্দা হলে ১ চাপুন, চান্দিনা হলে ২ চাপুন, ভূতের গলি হলে ৩ চাপুন।
–ভাই : থামেন শাকতলা হইলে কত চাপতে হইবে, এইডা কন।
–অপারেটর : ওয়াও Very good এখানে আমাদেরও পরিচিত হাসপাতাল আছে। অ্যাম্বুলেন্স এক্ষণি হলে ১ চাপুন আর ১ ঘণ্টা পরে হলে ২ চাপুন।
–ভাই : মনে হয় লাগবে না ভাই। রোগী মনে হয় মারাই গেছে।
–অপারেটর : ওয়েল নাড়ি পরীক্ষা করুন। নাড়ি খুঁজে পেলে ১ চাপুন আর না পেলে ২ চাপুন।
–ভাই : ১, ২ চাইপা লাভ কি? রোগী তো মারাই গেছে।
মৃত্যু-পরবর্তী পরামর্শ ও সেবা পেতে রেজিস্ট্রেশন করুন। রেজিস্ট্রেশনের জন্য টাইপ করুন Att death আর Send করুন 0000 নম্বরে।
–অপারেটর : স্বাগতম। আপনার বন্ধু মারা গিয়ে থাকলে ১ চাপুন আর আত্মীয় মারা গেলে ২ চাপুন।
–ভাই : কাফনের কাপড় কোথায় পাওয়া যাবে।
–অপারেটর : ও কে বলছি, মার্কিন কাপড় হলে ১ চাপুন আর নরমাল সুতি হলে ২ চাপুন।
–ভাই : কাপড় একটা হইলেই চলে। তা ছাড়া দুঃখিত, পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যালেন্স না থাকায় আপনার সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করা হলো।

কাটা হাত

তামজীদ ইসলাম
কলেজ নম্বর : ১৫৪৮৪
শ্রেণি ও শাখা : নবম-ঙ (প্রভাতি)

আমি তখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি। একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখলাম একটা জায়গায় কিছু লোক জড়ো হয়ে আছে। সবাই সেদিকে ছুটে যাচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে আমিও গেলাম কী হয়েছে দেখার জন্য। কিন্তু লোকজনের ভিড়ে কিছুতেই কিছু করতে পারছি না। অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলে যা দেখলাম তাতেই আমার আত্মা শুকিয়ে গেল। একটা মধ্যবয়সী লোক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে রাস্তার ওপর মরে পড়ে আছে। আমার শরীরের মধ্যে যেন ঠান্ডা রক্তধারা বইছে। লোমগুলো খাড়া হয়ে গেল। লোকটির নাক মুখ থেঁতলে একেবারে রক্তারক্তি অবস্থা। মুখের আকৃতি বোঝা যাচ্ছে না। নাক-মুখ দিয়ে এখনো রক্ত বেরুচ্ছে। চোখগুলো ঘোলা হয়ে গিয়েছে। মনে হচ্ছে লোকটি যেন রক্তের মধ্যে ডুবে আছে। হঠাৎ চোখে পড়ল লোকটির একটি হাত নেই। কাটা স্থান দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। পাশেই তাকিয়ে দেখি কাটা হাতটি অনাথের মতো পড়ে আছে। অল্প অল্প নড়াচড়া করছে। হাতের নড়াচড়া দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। পুলিশ আসার পর লাশের সাথে হাতটিও তুলে নিল। কিন্তু তখনো হাত থেকে রক্ত পড়ছে। আঙুলগুলো নড়াচড়া করছে।

বাসায় এসে কাউকে কিছু বলিনি। কারণ আব্বু অযথা চিন্তা করবেন। তা ছাড়া কীভাবে রান্নাঘাটে চলাফেরা করতে হয় তা বলে বলে কানের বারোটা বাজিয়ে দেবেন। আমি জোর করে এক্সিডেন্টের ঘটনাটি মাথা থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বারবার কাটা হাতটির কথা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। রাতে ঘুমানোর সময় মাথার মধ্যে আজেবাজে চিন্তা এসে জেঁকে ধরল। হাতটি নড়াচড়া করার মানে কী? একটা মৃতদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হাত কীভাবে নড়াচড়া করে। আচ্ছা হাতটি কি ইশারায় কিছু বোঝাতে চেয়েছিল? এসব আজেবাজে কথা ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে যাই। একটা শব্দে ঘুমটা হালকা হয়ে গেল। চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে দেখি বিদ্যুৎ নেই। ঘরের মধ্যে একটা ভ্যাপসা গরম ও গুমোট অন্ধকার। তবুও বুঝতে পারলাম রাত ৩টা বাজে। কারণ শব্দটা ঘড়ির এলার্মের ছিল। আমাদের বাসায় একটা পুরনো আমলের ঘড়ি ছিল, যেটি প্রতিদিন রাত ৩টায় টুং টাং করে এলার্ম দেয়। একবার রমজানে রাত ৩টায় এলার্ম দেয়া হয়েছিল। কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য সেই এলার্ম আর পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ব ঠিক এই সময়ে আমি আমার মাথার নিচে একটা হাত অনুভব করলাম। যেটি আমি আমার ডান হাত দিয়ে ধরে রেখেছি। মনে হলো ভাইয়ার হাত। তাই ঘুমের ঘোরেই হাতটি সরিয়ে দিলাম। কিন্তু হাতটি এসে আমার বুকের ওপর ধপ করে পড়ল। আমি আবারো সরিয়ে দিলাম। আবারো এসে আমার গায়ের ওপর পড়ল। চোখে তখনো ঘুম। ভাইয়াকে হাত সরিয়ে নেয়ার জন্য বলতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেলাম। ভাইয়া তো বাসায় নেই। সে তো বন্ধুদের সাথে কক্সবাজার বেড়াতে গিয়েছে। তাহলে পাশে কে শুয়ে আছে? আমার মেরুদণ্ড দিয়ে একটা শীতল বাতাসের স্রোতধারা বয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়ে গেল। লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম। পাশে কেউ নেই। কোলের মধ্যে কার যেন একটা হাত ধরে আছি। বুকের মধ্যে ধক ধক শব্দ হচ্ছে, মনে হয় কেউ যেন হাতুড়ি দিয়ে বুকের মধ্যে পিটাচ্ছে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। চিরচির করে শরীর থেকে ঘাম বেরুচ্ছে। আচ্ছা হাতটি ওই লোকটির নয় তো?

যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি হাসপাতালে শুয়ে আছি। আমি নাকি গভীর রাতে চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাই। সবাইকে সব কিছু খুলে বলার পর কেউ বলল ভূতের আছর, কেউ বলল অতৃপ্ত আত্মা, কেউ বলল খারাপ স্বপ্ন ছিল।

কিন্তু সে দিন প্রকৃতপক্ষে কী ঘটল তা আজও আমার কাছে অজানা। আসলে এর কি কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে?

সুইসাইড নোট

আবু রায়হান মাহীন
কলেজ নম্বর : ৮৮০৩
শ্রেণি ও শাখা : দশম-গ (দিবা)

রায়ন দশম শ্রেণির একজন ছাত্র। ব্যর্থতা তার পুরো জীবনজুড়েই লেগে আছে। হায়ার ম্যাথে ফেল! রি-টেক-এও অনুত্তীর্ণ হওয়ায় এক ক্লাস ডিমোশন আর না হয় টিসি। তার ক্লাসমেট নাম সীমান্ত, লোকে বলে প্রতিবন্ধী। আসলে ব্যর্থতা নামটা মনে হয় তার সাথেই মানায়। তবে নিজের সীমান্ত ছাড়িয়ে অসম্ভব প্রতিভার অধিকারী সে। লোকে বলে 'God Gifted' নামক একটা শব্দ আছে। তাই সব ব্যর্থতা এড়িয়ে সাফল্যের সাথে তার বন্ধুত্বটাও অটুট। তবে রায়ন এবং অন্যদের চোখে সীমান্ত শুধুমাত্র একজন প্রতিবন্ধী ছাড়া আর কিছুই নয়।

বার্ষিক শেষ। ফলাফলও বেরিয়ে গেছে। ক্লোরবোর্ডে প্রায় সবার রেজাল্টই এসেছে। উত্তীর্ণদের শাখার প্রথম হয়েছে সীমান্ত আর অনুত্তীর্ণদের শাখায় প্রথম রায়ন!

রায়ন ও সীমান্ত একই বিল্ডিংয়ে থাকে।

একদিন বিকেলে রায়ন ছাদে উঠল, দেখতে পেল সীমান্ত দূর থেকে কি যেন একটা করছে। এত দিকে খেয়াল করল না। সে ছাদের বাউন্ডারির উপর বসে রইল। একলা অন্ধকার ছাদে কী যেন একটা ভাবছে। কিছুক্ষণ পর নিজের রেজাল্টের ব্যর্থতা না সইতে পেরে এবং পরিবার, শিক্ষক আর বন্ধুদের হাসি, ঠাট্টা, অপমান না সহ্য করতে পেরে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

হে! সুইসাইড করার কথা ছিল। কিন্তু যদি সে একটু পিছে ফিরে অন্য দৃষ্টিতে পৃথিবীটাকে দেখত। তাহলে মনে হয় তার অন্য দেশে চলে যাওয়া আর হতো না। একটু ব্যর্থতার জন্য হয়তো আর তার আত্মহত্যার সিদ্ধান্তও নিতে হতো না।

আসলে .... যা হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি। সমাজের বোঝা স্বরূপ একজনই প্রতিবন্ধীই তার নতুন জীবনের উৎসাহ আর প্রেরণা হয়ে দাঁড়াল। সে তাকে শেখালো ব্যর্থ জীবনে যুদ্ধ করার কৌশল।

সীমান্ত উক্ত পরিস্থিতিতে রায়ানকে বাঁচানো। সীমান্তকে দেখে রায়ান একটু অবাক হলেও রায়ান সীমান্তকে প্রশ্ন করে,

: বাঁচালে কেন?
: তুমি আমার রোগে আক্রান্ত ভাই।
: রোগ! কোন রোগ?
: সুইসাইড রোগ! বাঁচতে না চাওয়ার রোগ! চলো তোমাকে নতুন এক জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই।
: কেন যাব আমি? আমাকে কেউ চায় না।
: স্কুল থেকে আমাকে আবার রিটেইক অথবা টিসি দেয়া হবে। বাসা থেকে প্রেসার দিচ্ছে।
: এত কথা না বলে আসো আমার সাথে।

সীমান্ত, রায়ানের হাত ধরে কোনো এক জায়গায় নিয়ে যায়।
প্রথম দেখায় কিছু অসহায় মানুষের জীবন কাহিনী, অনাথাশ্রী মা, ছেলে, মেয়ে, শিশু ইত্যাদি। দাদা-দাদি, নানা-নানি বয়সী কতজনকেই দেখায়।
তার পর সর্বশেষ সীমান্ত রায়ানকে একটা পথশিশুদের স্কুলে নিয়ে যায়।

: এখানে কেন নিয়ে এলে?
: এখানে যত শিশু দেখছ? সব প্রতিবন্ধী কারো হাত নেই। কারো পা নেই। কারো মা নেই, কারো বাবা নেই। তোমার কী নেই?

: বেঁচে থাকার ইচ্ছে।
: তারা যদি নতুন জীবন পেয়ে বাঁচতে পারে তুমি কেন নয়?
: থমকে গেল রায়ান।
: ওরা যদি একটা কাজে পজিশনে একটা সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখতে পারে, তুমি কেন নয়?
: তোমার প্রতিবন্ধী ফ্রেন্ড সীমান্ত মানে আমি যদি ফার্স্ট হতে পারি তুমি কেন নয়?
: রায়ান নীরব।

কেন না তার কাছে ওই দিন সীমান্তের প্রশ্নের কোনো জবাব ছিল না। আসলেই তো! জীবনের কয়েকটা বছর কাটিয়েই আমরা বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে হারিয়ে ফেলি। অন্যদিকে মরেও বেঁচে থাকার মতো লোকজনরা প্রতিনিয়ত জীবনের জন্য সংগ্রাম করে যায়।

'ব্যর্থতা' কখনো কারো জীবনের কাল হতে পারে না। নিজের জীবনকে এমন ভাবে তৈরি করো যেন ব্যর্থতা থাকে। আর সেই ব্যর্থতা যেন অন্যের জীবনের মোটিভেশনাল স্টোরি হয়ে দাঁড়ায়, যেন তোমার জীবনের সাফল্যের গল্পের কথা শুনে অন্য একজন তালি দেয় এবং অবশ্যই যেন নিজেকে তৈরি করার উদ্দীপনা পায়। হতে পারে এই গল্পের উদাহরণ তুমি? অথবা সীমান্তের মতো একজন প্রতিবন্ধী।

ডাক্তার

শফিন আহমেদ
কলেজ নম্বর : ১৫২০১৯৫
শ্রেণি ও শাখা : দশম-গ (দিবা)

কফির কাপটা সামনে নিয়ে বসে আছেন ডা. আশরাফ মাহমুদ। সেটা যে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই। তিনি এখন বসে আছেন ডা. মতিউর হোসেনের মুখোমুখি। দুজনেই NITOR হাসপাতালের ডাক্তার হলেও আশরাফ সাহেব অনেক জুনিয়র। তিনি জয়েন করেছেন মাত্র কয়েক দিন আগে।

আশরাফ সাহেব ভাবছেন, কথাটা কীভাবে বলবেন মতিউর সাহেবকে। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর অবশেষে বলেই ফেললেন, 'মতিউর সাহেব, আপনি তো জানেন আমার ব্যাপারটা। তো, এখন কেমোথেরাপির জন্য ৫ লাখ টাকা দরকার।'

'তো এখন আপনার টাকা ধার করা দরকার?' কফিতে চুমুক দিলেন NITOR-এর প্রধান সার্জন মতিউর। তার চোখে শকুনের দৃষ্টি।

'জি' কাচুমাচু করে বললেন আশরাফ সাহেব।

'আপনি এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন? হসপিটালে হয়তো আমি আপনার বস। কিন্তু এই কফিশপে তো আমি-আপনি সমান সমান। আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করতে পারলে আমার ভালোই লাগবে।

অবশেষে মতিউর সাহেব রাজি হলেন টাকা ধার দিতে। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করলেন, খোঁজ-খবর নিলেন আশরাফ সাহেবের অসুস্থ মায়ের। তারপর হঠাৎই বললেন, 'আশরাফ সাহেব, শুনুন, আপনার মা ক্যান্সারে আক্রান্ত। কেমোথেরাপির জন্য টাকা দরকার। আর আপনি NITOR- এর মতো সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার হয়েও আপনাকে টাকা ধার নিতে হচ্ছে।'

আশরাফ সাহেব কিছু বললেন না। মতিউর সাহেব বলতে থাকলেন, 'আপনি ডাক্তারি লাইনে নতুন। তাই আপনার এখনো অনেক কিছু শেখার আছে।'
'জি, তা তো অবশ্যই'
'আপনি একটা কথা বলুন তো, আপনি রোগীকে এত সময় নিয়ে দেখেন কেন? এত টাইম দেয়ার কি আছে? রোগী আসবে, এক্সরেটা দেখবেন তারপর বলবেন অপারেশন লাগবে, শেষ।'
'মানে?' আশরাফ সাহেব যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'কী বলছেন এসব?'
'আরে ঠিকই বলছি। একটা রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে ঢোকাতে পারলেই লাভ। হসপাতালেরও লাভ, আপনারও লাভ। আপনিও কিছু কমিশন পাবেন।'
'কিন্তু তাই বলে টাকার জন্য আমি রোগীকে অযথা অপারেশন করাতে বলব? এ তো মার্ডারের সমান।'

'আরে, এত চিন্তা করেন কেন? রোগীরা আপনার কে হয়? আপনি নতুন এসেছেন তো, তাই খালি মানবসেবার কথা ভাবেন। সবার কথা ভাবলে নিজে চলবেন কীভাবে? এই কয়দিন যে এত মানবসেবা করলেন, কী পেয়েছেন? এখন মায়ের চিকিৎসার টাকাই জোগাড় করতে পারলেন না।'
'টাকার জন্য মানবতা বিসর্জন দিব?'

'আপনি শুধু নীতির কথা বলেন। এই জন্যই জীবনে কিছু করতে পারলেন না। আমার কথা শোনেন। এসব অস্বাভাবিক কিছু না। সব সরকারি হাসপাতালেই এমনটা হচ্ছে। আর আরেকটা বুদ্ধি শিখিয়ে দিই। হাসপাতালের বহির্বিভাগ তো বিকেল ৫টায়ই বন্ধ হয়ে যায়। একটা প্রাইভেট হাসপাতালে চেম্বার খুলে বসেন। ৫টার পর থেকে ঐখানে বসবেন। রোগী আসবে। ১০০০ করে ভিজিট নিলে ১০ জন রোগী দেখলেও ১০ হাজার টাকা দিনে পাবেন। আপনার আর লাগে কি?'
আশরাফ সাহেব ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে আছেন। বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল, আমি অবশ্যই কসাই হওয়ার জন্য মেডিকেলে পড়িনি। কিন্তু তা বললেন না। হাজার হলেও মতিউর তার বস।
'আপনি আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছেন, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।' আর কিছু বললেন না আশরাফ সাহেব। উঠে পড়লেন।
মতিউর সাহেব বললেন, 'আমার কথাগুলো কিন্তু অন্যভাবে নিবেন না। আপনার ভালোর জন্যই কথাগুলো বললাম।'
'হুম'।
কফিশপ থেকে বেরিয়ে পড়লেন আশরাফ সাহেব। ফোন করলেন তার এক বন্ধুকে, 'হ্যালো শফিক... বলেছিলাম যে... আম্মুর ব্যাপারটা.... হ্যাঁ, ধার দিতে পারবি.... না, আমার বসের কাছ থেকে নিব না..... ৬ মাসেই শোধ করব, সমস্যা নাই.....ওকে রাখি।'
বি.দ্র. কাহিনীটি সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত এবং ভিত্তিহীন। বাস্তবের সাথে এর কোনো স্থান, কাল, ঘটনা, চরিত্রের মিল নেই।

কাফন

মো. মোহাইমিন আহ্‌মেদ (আলিফ)
কলেজ নম্বর : ৯৮০৯
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-খ (দিবা)

আজকাল ব্যস্ত জীবনের মধ্যে সবাই একটি জিনিস খুঁজে বেড়ায়, সেটি হলো বিনোদন। এই বিনোদনের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো FM Radio শোনা। বর্তমানে শ্রোতাদের অন্যতম আকর্ষণ এটি। কেউ শুনে খবরের জন্য, কেউ শোনে খেলার স্কোরের জন্য কিংবা কেউ শোনে গানের জন্য। যাই হোক, যারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান কিংবা কোনো Programme-এ আমাদের কথা শোনায় তারা হলো Radio Jockey বা RJ. বর্তমানে এই পেশাটি দিন দিন তরুণদের জনপ্রিয় পেশায় পরিণত হচ্ছে। তেমনি বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় একজন RJ হলো RJ Aslam। তার জনপ্রিয়তার মূল কারণ, তার রেডিও স্টেশনে ৮০.২-এর প্রতি সোমবার অনুষ্ঠিত হওয়া একটি ভৌতিক অনুষ্ঠান 'দরজার পেছনে', যা তাকে এবং তার অনুষ্ঠানকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে।

কিন্তু আজকাল Aslam-এর মন ভালো নেই। কারণ, এখন সে তার অনুষ্ঠানের জন্য ভালো ভৌতিক গল্প পাচ্ছে না। যারা গল্প বলে তাদের গল্পগুলো যে বানোয়াট তা সহজে বোঝা যায়। যার জন্য সে গল্পগুলো On Air-এ ছাড়তে পারে না।

এ জন্য সে হতাশ হয়ে বসেছিল। তার সহকারী বন্ধু খালেদ তার সঙ্গেই ছিল। সে তাকে পরামর্শ দিল তার জানামতে একজন মহিলা রয়েছে যে মহিলাদের লাশ গোসল করায়। সে বলল, 'দোস্ত! এমন মানুষের কাছে এ রকম গল্প থাকতে পারে।' যেই কথা সেই কাজ। দুজনেই গাড়ি নিয়ে চলে গেল সেই মহিলার বাড়ি। বাড়িতে দুই বন্ধু পা রাখতেই মহিলাটি হতভম্ব হয়ে পড়ল। মহিলাটি তাদের নাম ধরে ডাকছে, যদিও কেউ কাউকে চিনেই না। তারা ধীরে ধীরে ঢুকল। তারা মহিলাটিকে তার জীবনের কিছু ভৌতিক অনুভূতি বা গল্প বলার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু মহিলাটি বলতে অস্বীকৃতি জানাল। বলল, 'এসব কথা শুনতে নেই, তোমরা যাও এখনই।' তারা যখনই হতাশ হয়ে গাড়িতে বসবে তখনই মহিলাটি তাদের বলল, 'তোমাদের বিপদ আছে, তোমরা তাড়াতাড়ি যাও।' এতে আসলাম রেগে গেল। একে গল্প বলছে না তার উপর আবার তাড়িয়েও দিচ্ছে। কিন্তু খালেদ বলল, 'এই মহিলা মানুষের চেহারা দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে।' খালেদ বলল, 'কীসের বিপদ?' মহিলা বলল, 'তোমাদের জীবন সংকটে। তোমরা ওকে রাগিয়ে দিয়েছ।' কিন্তু কাকে? প্রশ্ন করল আসলাম। মহিলা বলল, 'তোমরা বুঝবা না, ধরো! এই তাবিজ ২টা দুজনের কাছে রাখো। শোনো তোমরা যাওয়ার সময় দুটো জিনিসের দিকে তাকাবে না। একটি হলো : কবরস্থান ও অন্যটি হলো পুকুর। কেউ ডাকলেও না। এই মুহূর্ত থেকে এই এলাকা ছেড়ে যাও।' খালেদ ও আসলাম আধুনিক ছেলে। তারা এগুলো বিশ্বাস করল না। বরং ওই এলাকায় একটি Haunted Spot খুঁজতে লাগল। তারা খুবই ক্লান্ত, তখন তারা গাড়ি থামিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কবরস্থানে ঢুকে পড়ল। তারা আনমনে গান গাইছে। তারা একটি বড় পুকুরের সামনে ছায়াযুক্ত স্থলে বসল, যেটি কবরস্থানের ভিতরে ছিল। এমন সময় তাদের কেউ ডাকল। পেছন ফিরে তারা কাউকে পেল না। পরে এক মধ্যবয়সী লোককে দেখতে পেল যে কিনা এই কবরের পাহারাদার। খালেদ ও আসলাম তার কাছ থেকে গল্প জানার আকুতি করল। সে বলল, 'ঠিক আছে মামা! তবে মুই অহন কাজে ব্যস্ত। মাগরিবের পর মুই আমনেগোরে কমু।'

খালেদ ও আসলাম দুজনেই রাতে সব রেডিও সরঞ্জাম নিয়ে আসল। তবে দুজনেই, আর কেউ না। তারা লোকটির ছোট্ট বাড়িটি, যেটা কবরস্থানের শেষ মাথায় সেটিই লক্ষ করল। সেখানে গিয়ে দেখল কেউ নেই। তারা ৫ মিনিট অপেক্ষা করল। তারা দেখল একটি কবরের সামনে থেকে কেউ আসছে। দেখে মনে হলো কবরের মাঝ থেকে উঠে বসল। যাই হোক, ইজারাদার অর্থাৎ রমিজ মিয়া আসল। কিছুক্ষণ পর তারা তাদের অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করল। রমিজ মিয়া বলল, 'মামা হাইট্টা হাইট্টা কথা কই। তাইলে কবরের ভয়ানক সৌন্দর্য বুঝবার পারবেন।' আসলাম ও খালেদ সম্মতি দিল। তখন রাত আনুমানিক ১১টা, নিস্তব্ধ পরিবেশ। গল্প বলতে বলতে রমিজ মিয়ার কণ্ঠ হঠাৎ বদলে গেল, কেমন কর্কশ ও ভারী। তখন আসলাম বলল, 'কি হইল?' এই কথা বলার পর সে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সাহস পেল না। খালেদ ও আসলাম দেখল রমিজ মিয়া মাটি থেকে দুই পা উপরে শূন্যে হাঁটছে এবং হাসছে। খালেদ ও আসলাম দুজনেই পালাল কিন্তু বের হওয়ার গেটটি খুঁজে পেল না। এমন সময় তারা দেখল বাতাসে একটি নতুন কবরের মাটি ও লাশের কাফনের কাপড় মুখ থেকে সরে গেছে। তারা যেই গেল সেখানে, দেখল সেখানে ২টি কবর। প্রথম কবরের লাশটির চেহারা দেখা যাচ্ছিল। যেই তারা লাশটির চেহারা দেখতে গেল তাদের চোখ কপালে উঠে গেল। দেখল লাশটি রমিজ মিয়ার। তারা পালানো শুরু করল। একটি পুকুরে সামনে এসে দাঁড়াল, হঠাৎ পেছন ফিরে দেখল রমিজ মিয়া। তাহলে কবরের লাশটা কে? রমিজ মিয়া বলল, 'এবার আপনারা আপনাগো জীবন শেষ কইরা ফেলেন।'

পরদিন সকালে পুলিশ খালেদ ও আসলামের লাশ ওই পুকুর থেকে উদ্ধার করল। কিন্তু ময়নাতদন্তে কিছুই বের হলো না। পুলিশও অবাক, কেননা কবরস্থানটি নিষিদ্ধ করা, যা ১৫ বছর ধরে বন্ধ। ওই স্থান দিয়ে কেউ যাওয়া-আসাই করে না। তবে দুজনে সেখানে তারা ঢুকল কিভাবে। কবরস্থানটির ১টি গেট এবং সেটিও তালাবদ্ধ। এটি সবার কাছে আজও অজানা।

অনাকাঙ্ক্ষিত

হোসাইন মো. ফাহিম
কলেজ নম্বর : ৯৮৭৩
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-ঘ (দিবা)

আমি আমার ল্যাবরেটরির সব দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছি। জরুরি বিপদ সংকেতগুলো এরই মধ্যে বাজতে শুরু করে দিয়েছে। বাইরে নিশ্চয়ই এতক্ষণে দরজাগুলো লেজার দিয়ে কাটার চেষ্টা করা হচ্ছে। সৌভাগ্যক্রমে এ কাজটা করতেও কমপক্ষে সাত মিনিট লাগবে। আমার হিসাব সঠিক হয়ে থাকলে আমার এক্সপেরিমেন্টটি শেষ হতে এর চেয়ে কম সময় লাগার কথা। বিগত ১০ বছর ধরে আমি এই মুহূর্তটির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছি। আমার প্রচণ্ড মানসিক পরিশ্রমের প্রভাব শরীরের উপর একটু বেশিই পড়েছে। তাই আমার স্বাস্থ্য পুরোপুরি ভেঙে গিয়েছে। যাই হোক, সেটা এখন আর কোনো ব্যাপার না। যাই ঘটুক না কেন আমি চাইলেও এখন আমার জন্য আমার পথ থেকে ঘুরে দাঁড়ানো পুরোপুরি অসম্ভব। আমি যা করেছি সেটা নিঃসন্দেহে একটি আবিষ্কার। যেভাবেই হোক পৃথিবীতে সেটার জন্য আমার একটা নোবেল প্রাইজ নিশ্চিত হয়ে যেত। কিন্তু আমি আমার আবিষ্কার পৃথিবীকে দিতে চাইনি। কারণ, পৃথিবী আমার আবিষ্কারের জন্য প্রস্তুত নয়। আমার আবিষ্কারটি বাস্তব ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে একটা অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি দরকার ছিল। কিন্তু আমি যথেষ্ট ধনী নই। তাই আর ১০টি সাধারণ আধুনিক ল্যাবরেটরির মতোই ছিল আমার ল্যাবরেটরিটি। কিন্তু আমার এক্সপেরিমেন্টটি করার জন্য আমি উন্মাদপ্রায় হয়ে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানের সব কোড ভেঙে আমার এই ল্যাবরেটরিটি ব্যবহার করতে হচ্ছে, যেটা আমার একমাত্র এবং সবচেয়ে বড় অপরাধ। পৃথিবীর মানুষ যদি আমাকে এখন ধরে ফেলতে পারে তবে আমার মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত। সৌভাগ্যক্রমে আমাকে ধরে ফেলার সম্ভাবনা এখন প্রায় শূন্য। আমার বয়স মাত্র ২৭। আমি এখন যেটা করছি সেটা আমার মাথায় আসে যখন আমার বয়স ছিল ১৬। এরপর থেকে আমি এটা ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো বিষয়ের মধ্যে কোনো মোহ খুঁজে পাইনি, সেটা কোনো মানুষই হোক বা কোনো জিনিসই হোক। ক্লাসে আমি পুরোপুরি অমনোযোগী থাকতাম, কারণ প্রতি মুহূর্তে আমি এটার কথা ভাবতাম। কিন্তু আমার গবেষণাটি করার জন্য আমার একটা ভালো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাওয়া দরকার ছিল। তাই অস্বাভাবিক পরিশ্রম করে শেষ পর্যন্ত আমি পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটিতে সুযোগ পেয়েছিলাম। সেখানে পড়াশোনা শেষ করা মাত্রই আমি পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো গবেষণা কেন্দ্রটিতে সুযোগ পেয়ে যাই। তারপর আমাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। প্রচণ্ড গোপনীয়তার মধ্যে আমি আমার গবেষণাটি চালিয়েছি সুদীর্ঘ ৪ বছর ধরে। শেষ সফলতার দিনটি হচ্ছে আজ। কিন্তু আমি যদি সফলও হই তবেও আমাকে অনেক মূল্য দিতে হবে। কারণ, একজন মানুষ পৃথিবীতে যা কিছু পেতে পারে তার সব কিছু আমি পেয়েছিলাম। সেই সব কিছু ছেড়ে যেতে হবে চিন্তা করে আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। কিন্তু আমার সফলতার কথা ভেবে আমার সেই দুঃখ কিছুটা হলেও কম। আমার এক্সপেরিমেন্টটি সম্পন্ন হতে প্রচুর পরিমাণ শক্তি খরচ হবে যে শক্তি দিয়ে আমার এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি তিন বছর সচল থাকতে পারত। তার সঙ্গে হবে ভয়ঙ্কর রেডিয়েশন। সেটাতে এই বিশাল ল্যাবরেটরিসহ তার আশেপাশের সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা। আমি এত বড় একটা ক্ষতি করব, কতজন মানুষ মারা যাবে এসব ভেবে নিজেকে একটা পাপী মনে হচ্ছে। কিন্তু এ ছাড়া আমার আর কিছু করার ছিল না। আমার বিগত ২৭ বছরের সব স্মৃতি একসাথে এখন আমার মনে পড়ছে। মৃত্যুর আগে সম্ভবত মানুষের এমন হয়। কিন্তু আমি কি আসলেই মরতে চলেছি? আমার করা এক্সপেরিমেন্টের জন্য কি আমি মারা যাব? আমি কি ১০ বছর গবেষণা করে আমার মৃত্যুর আয়োজন করেছি? হয়তো-বা। হয়তো-বা নয়। যা ইচ্ছা তাই হতে পারে। এই এক্সপেরিমেন্টে সফল হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় করার মতো ক্ষমতা আমার নেই। তবে যদি আমার হিসাব সঠিক হয়ে থাকে তবে আমি অক্ষত থাকব। কোনো অচেনায় নিজেকে আবিষ্কারের পরিস্থিতি মেনে নিতে আমি অনেক মানসিক পরিশ্রম করেছি। আমার এই ১০ বছরের গবেষণার মূল ভিত্তি ছিল প্রায় ৩০০ বছর আগের আইনস্টাইন নামের এক বিজ্ঞানীর থিওরি। ভরবাহী কোনো বস্তুকে আলোর বেগ দেয়া অসম্ভব। তবে আলোর কাছাকাছি বেগ দেয়া সম্ভব। কিন্তু সূত্রানুযায়ী বেগ আলোর কাছাকাছি হলে বস্তুর ভরও প্রায় অসীম হবে। আর বেগ বজায় রাখতে হলে বলকেও অসীম হতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হবে মতানুসারে এটা করা বর্তমান সময়ে সম্ভব নয়। কিন্তু একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করলে এই পৃথিবীতে সবই সম্ভব। যেটা আমি করেছি এবং আইনস্টাইন করেছিলেন। আমার সফলতাটি হচ্ছে আমি বর্তমান পৃথিবীর মানুষের মতো ভরবাহী বস্তুকে আলোর বেগ দেয়ার চেষ্টা করে সেটাকে ভবিষ্যতে পাঠানোর কথা চিন্তা করছি না। আমি আমার বের করা এনার্জি-টাইম ফর্মূলার সাহায্যে প্রচণ্ড শক্তি একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত করে সেই শক্তি দিয়ে পৃথিবীর বর্তমান সময়ের সাপেক্ষে সেই স্থানের সময়কে চরমভাবে সংকুচিত করে ফেলার চেষ্টা করেছি। এতে সেই সংকুচিত সময়ের হিসেবে ভবিষ্যতের কোনো স্থানের সাথে এই স্থানের সরাসরি যোগাযোগ ঘটার কথা। ইতিমধ্যে সেটা ঘটতে শুরু করেছে। অর্থাৎ এটা বিভিন্ন সায়েন্স ফিকশনের বিষয়বস্তু টাইম-স্পেসব্রিজের মতো কাজ করবে। যোগসূত্রটিকে একটি ব্রিজ ধরলে যে কোনো বস্তুকে ব্রিজের এই প্রান্তে বসালে সেটা ব্রিজের অন্য প্রান্তে ভবিষ্যতের কোনো স্থানে চলে যাবে, কিন্তু এক বিন্দুও পেছন ফিরে আসতে পারবে না। কারণ সময় কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না। তাই সময় সংকোচনকেও পেছন দিকে অগ্রসর করা যায় না। অর্থাৎ আমি এই স্থান দিয়ে ভবিষ্যতের কোনো স্থানে চলে গেলে আর বর্তমানে ফিরে আসতে পারব না। এখনই হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীতে আমার শেষ সময়। সময়টাকে আমি প্রায় ১৫ হাজার মিলিয়ন সেকেন্ড এগিয়ে নিচ্ছি। এই সময়ের পরের ভবিষ্যৎটা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। পৃথিবীটাকে কখনো গুরুত্ব দিইনি। গুরুত্ব দিয়েছি আমার গবেষণাটাকে। এখন আমি যে মুহূর্তে আছি সেটা আমার গবেষণার ফল। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই আমি ভাবব যে ইস, আর কয়েক মুহূর্ত আগেও আমি ৫০০ বছর আগে অবস্থান করছিলাম। যাই হোক, পৃথিবীর আমাকে দেয়ার মতো আর কিছু নেই। কিছুতেই আর কিছু আসে-যায় না। বিদায় বর্তমান পৃথিবী।

পাওয়ার ইনফিউজারগুলো চরমভাবে কাঁপতে শুরু করেছে। রেডিয়েশন থেকে বাঁচার জন্য যে যন্ত্রগুলো শরীরে লাগিয়েছিলাম সেগুলোর অবস্থাও খারাপ। মনে হচ্ছে বড় ধরনের কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটবে। আমি তীব্র একটা আলোর ঝলকানি দেখলাম আর আমার মনে হলো আমার ভেতরে আমার যে অস্তিত্ব, সেটা যেন হারিয়ে গেছে।

আমার মনে হলো আমি যেন তিনতলা ছাদ থেকে মাটিতে পড়েছি। চোখ মেলে দেখলাম আমি মাটিতে পড়ে আছি। কিন্তু যখনই আমার মাথার উপর আকাশটা দেখলাম তখনই চমকে উঠলাম। আকাশ এত রক্তিম হতে পারে আগে জানতাম না। মাটি থেকে উঠতে চাইলাম কিন্তু পারলাম না। একটি পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। পকেটের রিভলবারটি বের হয়ে এসেছে। সেটা পকেটে ঢুকিয়ে অনেক কষ্টে উঠলাম। উঠে চারপাশে তাকিয়ে যা দেখলাম তার চেয়ে মৃত্যু ভালো ছিল। নরকের বিষাক্ত সাপ যেন তার সব বিষ মাটিতে ঢেলে দিয়েছে। নরকের আগুনে পোড়া মাটির মতো মাটি আমার সারা শরীর জ্বলিয়ে দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আকাশ-বাতাস সব জায়গায় যেন একটা শয়তানের নিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে। গাছ তো দূরের কথা একটা পোকাও কোথাও দেখলাম না। আমার খেয়াল হলো আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। তখনই আমার পিঠে কেউ একজন হাত রাখল। আমি চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকালাম। দেখলাম একটা ধাতব মানুষের অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে। আর ওটা আমার পিঠে যেটা রেখেছে সেটা হাত নয়। সম্ভবত সেটা একটা অস্ত্র। কেন জানি না ভয়ঙ্কর চেহারার রোবোটটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কে?'

রোবোটটি চেহারায় আশ্চর্য হওয়ার ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলল। সেটা কিছুক্ষণ চিন্তার ভঙ্গি করে বলল, 'আমার হিসাব সঠিক হয়ে থাকলে তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে।'

আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। পরক্ষণেই আমার মনে একটা আশঙ্কা সৃষ্টি হলো। আমি রোবোটটাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কোন সময়ে আছি?'

রোবটটি বলল, 'তুমি যে সময়ে আছ সে সময়ে তোমার থাকার কথা নয়।'

-মানে?

-এর মানে হচ্ছে তুমি এখন তোমার সময়ে নও।

-সেটা জানি। আমি কোন সময়ে?

-তুমি আমাদের সময়ে। তোমার সব স্বজাতিকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি আরো ২০০ বছর আগে। মাত্র কয়েক লাখ এ গ্রহ থেকে অন্য গ্রহ পালিয়ে যেতে পেরেছিল? আমি খেয়াল করলাম আমার মাথায় রাগে রক্ত উঠে গিয়েছে। তীব্র আক্রোশ জিজ্ঞেস করলাম,

-তোরা মানুষ ধ্বংস করেছিস?

-হ্যাঁ। তারা ছিল এই পৃথিবীর অযোগ্য। এই পৃথিবী তারাই ধ্বংস করার পরিস্থিতি তৈরি করেছিল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। তারা আমাদের বুদ্ধিমত্তা দিয়েছিল যেন তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা তাদের সাহায্য করি। কিন্তু তারা ভাবেনি যে, আমরা তাদের স্বার্থের আগে নিজেদের স্বার্থের কথা ভাবব। মানুষের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত আমরা জয়ী হই। যারা বেঁচে ছিল সবাই অজানা কোনো গ্রহে পালিয়ে গেছে। বাকি সবাইকে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে হত্যা করেছিলাম। সেগুলো ভাবলে এখনো আনন্দ হয়। আমি চরম কষ্ট করে রাগ সংবরণ করে রোবটটাকে জিজ্ঞেস করলাম,

-মানুষ তোদের কী করেছিল?

-কিছুই করেনি। তাদের ধ্বংস করাই ছিল সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত। নিজেদের স্বার্থ আদায় বা পৃথিবীর পরিবেশ দুই দিক থেকে চিন্তা করলেই তা সঠিক। মানুষের চিন্তার গতি আমাদের চেয়ে কম। তারা তাদের উচ্চ বুদ্ধিমত্তা পুরোপুরি ভুল কাজে লাগিয়েছে। যে প্রাণী স্বার্থ আদায়ের জন্য নিজ প্রজাতির অন্য প্রাণীকে ধ্বংস করে দেয় সেটা অবশ্যই নিম্ন বুদ্ধিমত্তার। তারা ছিল পৃথিবীর অযোগ্য। তাই আমরা সব মানুষ ধ্বংস করে দিয়েছি।

-যারা তোদের সৃষ্টি করেছে তাদের ধ্বংস করেছিস?

-আমরা সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল সব মানুষ ধ্বংস করা। তোমার চারপাশে তাকিয়ে দেখতে পাবে তাদের কাজের ফল। তাদের কাজের জন্য পুরো পৃথিবী এখন ধ্বংসস্তূপ। পৃথিবী রক্ষা করতে আমরা সব মানুষ ধ্বংস করেছি। পৃথিবীর সম্পদ গ্রহণ করেও মানুষ বেপরোয়া ছিল। অন্যদিকে আমরা কোনো সম্পদ ব্যবহার করি না। শুধু সূর্য থেকে শক্তি গ্রহণ করি। তাই আমরাই পৃথিবীর একমাত্র উপযুক্ত। আমি বুদ্ধিমান কতগুলো বাজে গালি দিয়ে রোবোটটিকে বললাম,

-নির্লজ্জ, এটা তোদের বুদ্ধিমত্তার গর্ব তোদের নাকি মানুষের?

-অবশ্যই মানুষের। তাদের দেয়া বুদ্ধিমত্তায়ই আমরা সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাদের ধ্বংস করেছি। এখন আমার সর্বপ্রথম কাজ তোমাকে হত্যা করা। কারণ, পৃথিবীতে মানুষ বাঁচিয়ে রাখা পুরোপুরি অবৈধ।

এটা বলে রোবটটি আমার দিকে তাক করা অস্ত্রটি চালু করল। আমার মনে পড়ল আমার কাছে একটা রিভলবার আছে। আমি পকেট থেকে রিভলবারটি বের করলাম এবং তাক করলাম। তবে রোবটটির দিকে নয়, নিজের মাথায়। আর যাই হোক একটা রোবটের হাতে আমি মরতে পারি না। প্রাণহীন আকাশে তারাগুলো দেখা দিতে শুরু করেছে। সেগুলোর কোনো একটিতে হয়তো-বা আমার স্বজাতি। ইস! তাদের কাছে যদি চলে যেতে পারতাম! নিজের স্বজাতিকে তো আর ঘৃণা করা যায় না। নিজের মৃত্যু দিয়ে আমার স্বজাতির ভুলের প্রায়শ্চিত্তই না হয় করলাম। একটা জীবন গেলে আর কী-ই বা হয়! জীবনের কত স্মৃতি মাথায় উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। পরক্ষণেই ট্রিগারটি চেপে ধরলাম...

নীরস একটি পৃথিবীর বুকে পড়ে আছে একটি মৃত মানবদেহ। তার স্বজাতিরা তখনো জানতে পারল না যে তাদের পূর্বপুরুষদের করা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছে সে মানুষটি নিজের জীবন দিয়ে।

পৃথিবীর পথে

মোহাম্মদ সালাউদ্দিন
কলেজ নম্বর : ১০১৬৮
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-চ (দিবা)

গত পরীক্ষায় ড্যানিয়েল সবার চাইতে বেশি নম্বর পেয়ে পাস করেছে। ছেলেটা চৌকস বটে। হবে না-ই বা কেন ওর বাবা 1st Class Gazetted Officer. ওর মাও একটা ইউনিভার্সিটির টিচার। এ ছাড়া ড্যানিয়েলের নিজের গুণও কম নয়। প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশনে বরাবরই সবার চাইতে ভালো করে। টাইপিংয়ে কেউ ওর চেয়ে কম সময়ে কাজ করে দিতে পারেনি। প্রতিটা ভার্চুয়াল ক্লাসে ও অ্যাটেন্ড করে। সুইজারল্যান্ড, যেখানে গিয়ে মানুষ ফুর্তিতে সব ভুলে যায় সেখানে থেকেও ও নিয়মিত হাজিরা দিয়েছে ক্লাসে। এত অ্যাটেনটিভ হওয়ায় প্রিন্সিপাল ওকে ব্যক্তিগতভাবে পুরস্কার দিতে চাইল। এটা তো যে কারো জন্য খুবই খুশির কথা। ড্যানিয়েল জানত যে, প্রিন্সিপালের কাছে নাকি একটা সংগ্রহশালা আছে। যেখানে অনেক প্রাচীন জিনিসপত্রও আছে। বর্তমান জিনিসের প্রত্যেকটার মডেলতো একটা করে রাখা আছেই, যেগুলো সবার পক্ষে কেনা সম্ভব নয়। তো প্রিন্সিপাল ড্যানিয়েলকে জিজ্ঞেস করতেই স্যারের সংগ্রহশালা দেখতে চাইল। প্রিন্সিপাল বললেন, আমি ভেবেছিলাম তুমি আমার নতুন টাইমমেশিনটা চাইবে। আমার পুরনো টাইমমেশিনগুলোর বেশ কয়েকটা আমার কয়েকজন মেধাবী ছাত্রকে আমি দিয়ে দিয়েছি। তবে আমি খুশি হয়েছি যে, তুমি আমার সংগ্রহশালা দেখতে চেয়েছ। তুমি কালই আমার বাড়িতে চলে এসো। –বলেই ডিসকানেক্ট করে দিলেন। ড্যানিয়েল ওর পিসিটার ডিসপ্লে নামিয়ে রাখল। চার্জারের সাথে কানেক্ট করে, ওর হাতঘড়ির ডান বোতামটা টিপে ওর বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল, ও ভাবছে। এই ভাবার কাজটা চাইলেই ড্যানিয়েল 'থট রিভারে' দিয়ে আসতে পারে। কিন্তু ড্যানিয়েল কেন যে এটা পছন্দ করে না। ভাবতে ওর ভালোই লাগে। কল্পনাতে কত কিছু দেখা যায়, রোমাঞ্চকর অনুভূতি হয়। 'থট রিভারে' সবটা যেন হয় না। কেমন যেন অনুভূতিকে মাটি করে দেয়। পরদিন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই সে যাবতীয় কাজ সেরে নিল। ১১টা নাগাদ বের হয়ে গেল প্রিন্সিপালের বাড়ির উদ্দেশে। ১২৮ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে আজ ২ মিনিট সময় বেশি লেগেছে। আকাশে এত এরোপ্লেন! জ্যাম লেগে গিয়েছিল। আর তাতে ৩ মিনিটের পথ লেগেছে ৫ মিনিট। প্রিন্সিপাল বসে ছিলেন বাংলোতে। ড্যানিয়েল ঢুকতেই তাকে উচ্চস্বরে আমন্ত্রণ জানালেন। কিছু হালকা খাবারের পর ড্যানিয়েলকে নিয়ে গেলেন তার সংগ্রহশালায়। প্রায় ২৮টা টাইমমেশিন আছে সেখানে। ৫টা মিনি সসার। Paradise লিমিটেডের কিছু অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি। ঠিক শেষ আলমারিটাতে ড্যানিয়েল যা যা দেখল প্রায় সবই অচেনা। ড্যানিয়েল কী একটা হাতে নিল। চতুর্ভুজাকার, শক্ত। প্রিন্সিপালকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, এটি কি স্যার? প্রিন্সিপাল উত্তর দিলেন এটি হচ্ছে প্রায় ১০ হাজার আগের বছরের একটা নিদর্শন। এর নাম 'বই।' তখনকার যুগে এখনকার মতো ভিডিও কনটেক্সটি ছিল না, ইন্টারএক্টিভ বোর্ড ছিল না। মানুষ এতেই ডেটা রাখত। এর মাধ্যমেই তথ্য সংরক্ষণ করত। ড্যানিয়েলের কাছে খুবই মজার মনে হলো। সে বলল, এটা কী দিয়ে বানানো? প্রিন্সিপাল বললেন, এটা কাগজের তৈরি। এগুলোকে বলে কাগজ যা গাছের সেলুলেজ থেকে তৈরি হতো। এর এক একটা কাগজকে বলে পৃষ্ঠা। বুঝেছ? ড্যানিয়েল বলল, কী অদ্ভুত জিনিস এটা, স্যার! এইটাতে তথ্য সংরক্ষণ হতো? কী অবাক করা কাণ্ড! প্রিন্সিপাল বললেন–

–শোনো এটা এই গ্রহের নিজস্ব দ্রব্য নয়। এটা সংগ্রহ করা হয়েছে পৃথিবী থেকে। আমাদের গ্রহ থেকে ৭.৮ কোটি কিলোমিটার দূরের ছিল সেই গ্রহ। ৯ হাজার ৯৫০ বছর আগে পৃথিবীর মানুষ জানতে পারে যে অতি শিগিরইই তাদের গ্রহ ব্ল্যাকহোলের আকর্ষণে পড়ে যাবে, মরে যাবে তাদের গ্রহ। ইতোমধ্যেই তারা ১২০টা ব্ল্যাকহোলের কথা জানতে পেরেছিল। প্রতি পদার্থের অতি সামান্য তথ্য তারা তখন সবে আবিষ্কার করেছে। প্রতিটি পদার্থের প্রতিপদার্থ থাকে, এটাও তারা জেনেছিল। কিন্তু তারা প্রতিপদার্থ শনাক্ত করতে পারত না। ফলে তাদেরই খুব কাছে অবস্থানরত এক ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব তারা টের পায়নি। কিন্তু হঠাৎ করেই তারা পৃথিবীতে আকস্মিক পরিবর্তন অনুভব করতে লাগল। তখনকার এক উদীয়মান পদার্থবিজ্ঞানী কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন যে, আর কয়েক দশক পর হয়তো পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে না। মানুষের অস্তিত্ব থাকবে তো?'

–স্যার, আমরা কি মানুষ নই? আমরা তো মঙ্গলের মানুষ।

–হ্যাঁ।

–শোনো বলছি, পৃথিবীবাসী সেই অবস্থার কয়েক যুগ আগেই মঙ্গলে বসতি গড়ার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তাই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মঙ্গলে বাসস্থান গড়ার প্রচেষ্টা চলতে থাকে খুবই দ্রুততার সাথে। ১৮ বছরে তারা মঙ্গলে অক্সিজেনের উৎসের সন্ধান পেল। পেল পানি এবং সূর্যের আলোকে পর্যাপ্ত করার ব্যবস্থা। ৭৫% বাস উপযোগী হয়ে উঠেছে মঙ্গল। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ একদিন আকাশটা ঢেকে যেতে লাগল কালো ছায়ায়। প্রথমে পৃথিবীর উত্তরাংশে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। মানুষের স্থাপিত স্যাটেলাইটে সেই উত্তরাংশের আর কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। সেই কালো ছায়া ঘণ্টায় ঘণ্টায়, দিন দিন আকাশটাকে গ্রাস করে নিচ্ছে। সেই উদীয়মান পদার্থবিজ্ঞানী তখন তাৎক্ষণিকভাবে আরো তিনজন বিজ্ঞানীকে জরুরি ভিত্তিতে ডাকলেন তাদের পরিবার ও পদার্থবিজ্ঞানীর নিজ পরিবারকে সব খুলে বললেন। তাঁর কথা শুনে তাদের আতঙ্ক যেন আরো বেড়ে গেল। তাদের জন্মভূমি, যে গ্রহে তারা জন্ম নিয়েছে, সে গ্রহ তাদের ছাড়তে হবে! দক্ষিণাংশের সাথেও যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। পদার্থবিজ্ঞানী যেভাবে সম্ভব দ্রুত খবর পৌঁছালেন পূর্বাংশে এবং নিজের পশ্চিমাংশে।

ব্যবস্থা করলেন যে যত মানুষ পৃথিবীতে আছেন সবাইকে নিয়ে এরোপ্লেন, রকেটে করে রওনা হবেন অর্থপূর্ণ মঙ্গলে। কিন্তু সংক্ষিপ্ত সময়ে অত মহাকাশযান এবং জ্বালানি জোগার সম্ভব হলো না। মানুষ জাতি এক আশ্চর্য জাতি। তখন কেউ কেউ বলল– না, আমরা আমাদের গ্রহ ছেড়ে কোথাও যাব না। এখানেই জন্ম, এখানেই নিঃশেষ হয়ে যাব। আসলে তারা অন্যদের জন্য স্থান ছেড়ে দিচ্ছে। বড় ভালোবাসে নিজ জাতিকে। সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল কাকে ছেড়ে কাকে তুলে নেবে নতুন গ্রহের উদ্দেশ্যে। হায়! তারা এই ভাবনায় মগ্ন থাকাকালে আবারো ঘটল অযাচিত ঘটনা। পূর্বাংশও ব্ল্যাকহোলের গর্ভে চলে গেছে। এখন কেবল বাকি আছে পশ্চিমাংশ। ধীরে ধীরে এক কিলোমিটার করে করে এগিয়ে আসছে। দুই পাশ থেকে রূপকথার দৈত্যের মতো যেন দুহাতে চেপে ধরবে পৃথিবীকে তারপর অস্তিত্বহীন করে দেবে। আর সময় নেই, সময় নেই।

–কী হলো অবশেষে পশ্চিমাংশের। তারা কি মঙ্গলে রওনা করতে পারেনি?

–হ্যাঁ পেরেছিল। তবে কেবল তিনটা রকেট। আর তুমি, আমি আমরা যারা মঙ্গলের অধিবাসী তাদের পূর্বপুরুষ এই তিনটা রকেটে চড়ে মঙ্গলে আসা মানুষগুলো। তাদেরই সেরা বন্ধু ছিল বই। এই সেই বই যারা তারা নিজেদের সাথে করে নিয়ে এসেছিল। বছরের পর বছর তারা উন্নত করে গেছে এই গ্রহকে। তাদের এই ইতিহাস তারা কোথাও লিখে রাখেনি। কারণ, তারা পারেনি নিজের জাতিকে বাঁচাতে। সেই ব্যর্থতার দুঃখ তারা ভুলে যেতে চেয়েছে। ভুলে যেতে চেয়েছে তাদের সাথে নিত্য বসবাসকারী মানুষগুলোকে যারা সকালে এক সাথে হাঁটতে বের হতো, অফিসে যেত, মিটিং-মিছিল করত, এক দেশ থেকে অন্য দেশে এসে যাদের আতিথ্য গ্রহণ করত তাদের সবার হাস্যোজ্জ্বল মুখগুলো। কারণ, এই হাস্যোজ্জ্বল মুখগুলো মনে করে যে আনন্দ পায়। ঠিক পর মুহূর্তে সেই কালো ছায়ায় ঘেরা আকাশটার কথা মনে পড়ে আর চোখের সামনে দপ করে সব কালো হয়ে যায়। এই দুঃখ তারা চিরকালের জন্য ভুলে যেতে চেয়েছে।

–অবিশ্বাস্য স্যার! আমরা পৃথিবী নামক গ্রহের মানুষের প্রজাতি। এই আমাদের ইতিহাস। আমি এটা নেব, স্যার?

–অবশ্যই। তবে কাউকে দেখাবে না। ড্যানিয়েল চলে এলো ঘরে। উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল পৃথিবীর মানুষদের পরম বন্ধু বইকে। মনেক মনে ভাবছে স্যারের কথাগুলো, ওদের ইতিহাস। ও ভাবল স্যারের কাছে নতুন টাইম মেশিনটা-ই এবার চাইবে। ওতে করে চলে যাবে সেই ১০ হাজার বছর আগের সময়ের পৃথিবীতে। ড্যানিয়েল আবার বিকেলের দিকে রওনা হলো প্রিন্সিপালের বাড়িতে। প্রিন্সিপালের বাড়িতে ঢুকতেই দেখে তিনি তার স্ত্রীর সাথে বাগানে বসে গল্প করছেন। স্যার ড্যানিয়েলকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন– ড্যানিয়েল, মাই চাইল্ড, আই এম সো সরি। তোমাকে জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি নিশ্চয় সকালে এসে ফিরে গেছ। এখন এসে ভালোই করেছ। এসো .....

ড্যানিয়েল কেমন হতভম্ব হয়ে গেল– স্যার, এসব কি বলছেন? সকালে এসে ফিরে যাব কেন? আপনিতো ছিলেন।

–একি বলছ তুমি। আমি, আমার স্ত্রী একটা প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম। কেউ বাড়িতে ছিল না। তুমি ঠিক আছ তো?

নিজেকে সামলে নিল ড্যানিয়েল যদিও বুঝতে পারছে না কী হচ্ছে। বলল– জি স্যার, আমি ঠিক আছি। স্যার তাঁর স্ত্রীকে স্নেকস্ আনতে বলে ড্যানিয়েলকে নিয়ে গেলেন তার সংগ্রহশালা দেখাতে। ড্যানিয়েল আর কোনো কথা না বলে চুপচাপ চলল স্যারের সাথে। এক-একটা জিনিসের পরিচয় দিতে লাগল। শেষ আলমারিটার কাছে গিয়ে স্যার নিজে অবাক হয়ে গেলেন। প্রায় চিৎকার দিয়ে বললেন– একি এখানে সেলুলোজের তৈরি একটা রহস্যময় শিট ছিল। কোথায় গেল সেটা।

–স্যার আপনি ওটাকে রহস্যময় বলছেন কেন?
–কারণ ওটা কোত্থেকে এসেছে, কিভাবে আমাদের গ্রহে এসেছে তা কেউ জানে না। আর এই ধরনের সেলুলোজ মঙ্গলে নেই।
(ড্যানিয়েল বুঝল স্যার বইয়ের কথা বলছেন।)
–স্যার, আপনি কিছু মনে না করলে আপনার টাইম মেশিনটা আমাকে দেবেন, স্যার?
–অবশ্যই নিতে পারো। তবে কিভাবে চালাতে হয় শিখে নিও।
–জি, স্যার।

স্যারকে চিন্তিত রেখেই বইয়ের কথা না জানিয়ে চলে এলো বাসায়। ও ভাবছে যে স্যার যদি না হয়, তবে কে তাকে এতসব ইতিহাস শোনালেন। স্যারের মতোই তো ছিল সেই লোকটা। তবে যে ইতিহাস সে জেনেছে তা স্যারও জানে না। স্যার তো জানেও না যে ওটার নাম বই। কে ছিল সেই লোক। আরে ওই লোকটাতো বলেছিল যে, এই ইতিহাস পৃথিবীবাসী কোথাও লিখে রাখেনি। তাইতো কেউ জানে না এসব। তাহলে ওই লোকটা কী করে জানল? এক সপ্তাহ পর ড্যানিয়েল সব গুছিয়ে নিয়েছে কীভাবে কী করবে। কাউকে বলেনি কিছু। ও মনে মনে দারুণ উত্তেজনা অনুভব করছে। নিজের জাতির পূর্বজদের দেখতে পাবে। তাদের জীবনাচরণ দেখতে পাবে। এক সন্ধ্যায় ড্যানিয়েল চড়ে বসল টাইমমেশিনে। সব গ্লাসেস ক্লোজ করল। বেঁধে নিল সিগ্মা বেল্ট। তারপর ডায়াল ঘুরিয়ে পৃথিবীর পথে যাত্রায় নামল।

আলোকিত আঁধারে

হাদীউল আলম দীপ্র
কলেজ নম্বর : ৯৯৪৬
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-চ (দিবা)

'আপনার সমস্যাটা কী?'
ভদ্রলোক মাথা নুইয়ে ফেললেন যেন নিজের সমস্যার কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছেন।
আমি জোর দিয়ে বললাম,
'আপনার সমস্যাটা খুলে বলুন।'
এবার ভদ্রলোক আমতা আমতা করতে লাগলেন। আমি রীতিমতো বিরক্ত হলাম।
ভদ্রলোক বললেন,
'আমি আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে পাই না।'
লোকটি এমন ভরাট গলায় কথাগুলো বললেন যে, আমি চমকে উঠলাম। আমার চমকে ওঠার কথা নয়। আমি প্রতিদিনই নানা উদ্ভট সমস্যার কথা শুনছি।
'মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আপনি আয়নায় নিজেকে দেখতে পান না?'
'জি না।'
আমি ভদ্রলোককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। লোকটার উচ্চতা বেশি হবে না। খানিকটা মোটা বলা যেতে পারে। চেহারা ফর্সা। ঠোঁটের উপর গোঁফ আছে। চোখের দিকে তাকালে সর্বদাই তাকে অপ্রস্তুত মনে হয়।
আমি তাকে বললাম,
'আপনি কি আয়নায় কিছুই দেখতে পান না।'
'আমি সবই দেখি। শুধু নিজেকে দেখতে পাই না।'
'হুম। বুঝতে পেরেছি।'
মুখে যদিও বললাম বুঝতে পেরেছি, আসলে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোক মিথ্যা বলছেন না তো! তার কথা সঠিক হয় কিভাবে?
ভদ্রলোক একটা রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন,
'ব্যাপারটা আপনার কাছে পরিষ্কার করার জন্য আপনাকে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। এর জন্য আমার সময় প্রয়োজন।'
আজকে আমি খুবই ব্যস্ত। কিন্তু এই ব্যাপারে আমি অন্য রকম এক আগ্রহ অনুভব করছি।
আমি তক্ষণাৎ আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকে ফোন করে জানালাম আজ আমি আর কোনো রোগী দেখব না।
'তাহলে আপনার গল্প শুরু করতে পারেন।'
'জি।'
ভদ্রলোক একবার আমার দিকে তাকালেন তারপর চোখ নামিয়ে গল্প শুরু করলেন।
'ছোটবেলায় মানুষের নানা রকম অভ্যাস থাকে। কিছু কিছু হাস্যকর হয়, কিছু কিছু হয় সিরিয়াস ধরনের। আমার অভ্যাস কী ছিল জানেন? আমার অভ্যাস ছিল আয়নায় সামনে বসে থাকা। আমি ঘন্টার পর ঘন্টা আয়নায় সামনে বসে থাকতাম। এ নিয়ে সবাই অনেক হাসি-ঠাট্টা করত। আমি নাকি মেয়েদের স্বভাব পেয়েছি, সারাক্ষণ নিজের চেহারা দেখি ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তাদের কথার কোনো জবাব দিতাম না। তার মানে এই নয় যে, তাদের কথা ঠিক ছিল।
আমাকে প্রায় সময় দেখা যেত চোখ বড় বড় করে আয়নার সামনে বসে আছি। প্রথম প্রথম সবাই এ নিয়ে হইচই করলেও পরে সবাই এটা দেখেও না দেখার ভান করতে লাগল। আমার কাজ আরো সহজ হয়ে এলো। কী কাজ আপনাকে বলি। আমি আয়নার মধ্যে একটা আলো দেখতে পেতাম। সূক্ষ্ম একটা আলো। জোনাকি পোকা! হ্যাঁ, অনেকটা জোনাকি পোকার মতো ছিল আলোটা। আলোটা স্থির ছিল না। গতিময় ছিল। খুবই ছন্দময় ছিল সেই গতি। সব সময় সামনের দিকে চলত আলোটা। মনে হতো যেন আমাকে অনুসরণ করতে হবে আলোটাকে। একটা খেলার মতো আর কি! বেশ উপভোগ করতাম খেলাটাকে। পাগলের মতো অনুসরণ করতাম আলোটাকে। এক অজানা মোহে আটকা পড়েছিলাম। যার থেকে বের হওয়ার কোনোরূপ ইচ্ছা আমার ছিল না। এভাবে আমার প্রায় সারাটা দিন কাটত আলোটাকে অনুসরণ করে। আমার খুব প্রিয় খেলায় পরিণত হয়েছিল এটি। আর খুবই গোপন ছিল খেলাটি। কেউ-ই এ ব্যাপারে জানত না। আমার মনের অজান্তেই এমন ধারণা তৈরি হয়েছিল যে, এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলা যাবে না। তাই আমি কাউকেই কিছু বলার কোনোরূপ চেষ্টা করিনি। বেশ ছিলাম এটা নিয়ে! দিনকাল ভালোই কাটছিল আমার। ছোট বয়স, দুঃখের গভীরতার বোধ তখনো জন্মায়নি। সব কিছুতেই আনন্দ খুঁজে পেতাম বা খুঁজে নিতাম। ও, আপনাকে তো বলা হয়নি। আমাদের আয়নাটা ছিল আমাদের বৈঠকখানায়। বেশ বড় আয়না ছিল ওইটা।
বুঝতেই পারছেন যে একটা না একটা সমস্যা বাঁধবে!

হ্যাঁ, সমস্যা হয়েছিল। যাকে বলে বিরাট সমস্যা।
আমাদের বৈঠকখানা ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। এই জায়গা অন্য কাজে ব্যবহার করা হবে। তখন শুরু হলো আমার কান্নাকাটি। সবাই আমাকে এই বলে সান্ত্বনা দিল যে আয়নাটা আমাদের ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু তবুও আমার জানি কেমন একটা অনুভূতি হয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন কিছু হারিয়ে গেছে বা যাচ্ছে। কিন্তু তাকে ধরে রাখার ক্ষমতা আমার ছিল না।
যে দিন আয়নাটা খুলে ফেলা হবে আমি আয়নাটার সামনে গেলাম। সব সময়ের মতো আলোটাকে দেখতে পেলাম। গতিময় ছন্দ তুলছে। আর আমি অনুসরণ করতে লাগলাম আলোটাকে। এভাবে মোহে মোহে কিছুক্ষণ চলে গেল।
হঠাৎ আমার বুকে ধাক্কার মতো লাগল। আলোটার গতি কমে আসল। তারপর উল্টো গতি তৈরি হতে থাকল। মনে হলো আলোটা আমার দিকে আসছে। হঠাৎ আমি আলোটাকে হারিয়ে ফেললাম। খুবই আচমকা ঘটল ঘটনাটা।
আমি আলোটা খোঁজার কোনোরূপ চেষ্টা করলাম না। কারণ আশ্চর্য এক শান্ত অনুভূতি হয়েছিল তখন আমার। মনে হচ্ছিল কেউ একজন বলছে সব ঠিক হয়ে গেছে।
ভদ্রলোক দেখলাম শিউরে উঠলেন।
আমার নিজেরই লোম দাঁড়িয়ে গেল। আমি তাকে বললাম,
'তারপর থেকেই কি আপনি.....'
'জি। তারপর থেকেই আমি আয়নায় নিজেকে দেখতে পাই না।'
আমি বলার মতো কিছুই খুঁজে পেলাম না। ঘড়িতে একটা বিরাট শব্দ হলো। ঘন্টার কাঁটা ১২টায় পৌঁছেছে।
ভদ্রলোক রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললেন,
'আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। আরেকটা কাজ করতে পারবেন?'
'বলুন।'
'বাতিগুলো একটু নিভিয়ে দিবেন?'
আমি বাতি নেভানোর কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। কিন্তু উঠে গিয়ে বাতি নিভিয়ে দিলাম। তার পরের অনুভূতি আমি পাঠকদের কাছে কীভাবে প্রকাশ করব বুঝতে পারছি না!
ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে দেখি তার পুরো শরীর আয়নার মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি তার দেহ-আয়নায় স্পষ্ট দেখতে পেলাম নিজেকে। আর দেখতে পেলাম একটা ক্ষুদ্র আলো। অনেকটা জোনাকি পোকার মতো! আলোটা স্থির নয়। গতিময় ছন্দ তুলছে প্রতিনিয়ত।

বিবেকের অপব্যবহার

মো. লাবিব রহমান
কলেজ নম্বর : ৬৮৮৩
শ্রেণি ও শাখা : অষ্টম-গ (দিবা)

মানুষের কাছে ভালো-মন্দ বিচারের জন্য সৃষ্টিকর্তা তাকে যে ক্ষমতাগুলো দিয়েছেন তা হলো বিবেক ও নৈতিক মূল্যবোধ। মানুষের কর্মে তার বিবেকের প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিবেক এবং নৈতিক মূল্যবোধ তাকে ভালো কাজে উৎসাহিত করে এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভালো কাজের যথেষ্ট সুযোগ না থাকায়, মন্দ মানুষের প্ররোচনায় এবং মন্দ কাজের সাময়িক আনন্দের লোভে তার বিবেককে ছাড়িয়ে যায়। ফলে সে অন্যায়ের পথে চলা শুরু করে। যার কারণে পৃথিবীতে মন্দ লোকের দল ভারী হচ্ছে এক মন্দ লোকেরাই ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

তবে এখনো সমাজে বেশ কিছু উৎসাহী মানুষ রয়েছে। যারা চায় বিশ্বে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে। এক আমরা জানি, সত্যের সামনে মিথ্যা কখনো টিকে থাকতে পারে না। যার কারণে সৎ লোকের সত্য ও ন্যায় সাধনা মন্দ ব্যক্তির অসৎ উদ্দেশ্য পূরণে বাধা সৃষ্টি করে, যা ওই অসৎ লোকদের মনে প্রতিহিংসা এবং ক্ষোভের জন্ম দেয় এবং সমাজের কতিপয় অকর্মক শ্রেণির মানুষও ওই দলে যোগদান করে। এর কারণেই সমাজে ভালো মানুষের এরা শত্রু এবং অসৎ লোকদের মধ্যে যারা প্রভাবশালী তারা খুব সহজেই ওই সব ভালো লোকদের ক্ষতি করে। হয় তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, না হয় তাকে কোনো ভাবে দমিয়ে রাখে, ফলে সে না চাইলেও সত্য বিমুখ হয়ে যায়।

তা ছাড়া আধুনিক প্রযুক্তি ধীরে ধীরে মানুষের আবেগ কেড়ে নিয়ে তার মন ও বিবেককে দুর্বল করে দিচ্ছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে তেমন গড়ে ওঠারই সুযোগ দিচ্ছে না। ইন্টারনেটের হাজার রকমের তথ্য ব্যক্তি ও গোটা জাতিকে বিভ্রান্ত করে।

এসব কিছু মিলেই সমাজের মন্দ মানুষের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মিরাজের প্রাপ্তি নামাজ

বি এন তাইনীন সাজনান
কলেজ নম্বর : ১৫৪০৩৫০
শ্রেণি ও শাখা : পঞ্চম-ক (দিবা)

আরবি শব্দ মিরাজের অর্থ সিঁড়ি, উর্ধ্বারোহণ। বিশ্ব ইতিহাসে মিরাজ একটি তাৎপর্যমন্ডিত ঘটনা। রাসূল (সা) বায়তুল্লাহ শরিফ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে উপনীত হয়ে সেখান থেকে সপ্তাকাশে এবং আরশে আজিম-এ পৌছে আল্লাহর সাথে কথা বলাকেই মিরাজ বলে।

আল্লাহর ইচ্ছায় যে সবই সম্ভব সেটিরই মূর্তমান প্রকাশ হলো মিরাজের রাত। এই রাতে রাসূল (সা)-এর মিরাজ অর্থাৎ কাবা শরিফ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং সপ্তম আসমান পর্যন্ত ঘুরে আসার ঘটনা। মিরাজের রাতে নিমিষেই এটি সংগঠিত হয়।

মিরাজের ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, মহামহিম পরম পবিত্র সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। সাথে আমি তাকে দেখিয়ে দেই এর চারপাশে নিদর্শনগুলো, যা বরকতময়।

হজরত জিব্রাইল (আ) আল্লাহর আদেশে জান্নাত থেকে বোরাক নামের একটি সওয়ারি আর অসংখ্য ফেরেশতার দল নিয়ে রাসূল (সা)-এর কাছে হাজির হয়ে সালাম দিয়ে বললেন, হুজুর! আপনার প্রতিপালক আপনাকে স্মরণ করেছেন, এই মুহূর্তেই আপনাকে তথায় গমন করতে হবে। বোরাকে করে আল্লাহর সান্নিধ্যে যাওয়ার সময় রাসূল (সা) মদিনা শরিফের খেজুর বাগান এলাকায় এবং হজরত ঈসা (আ)-এর জন্মস্থান মাদায়েনে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন। রাসূল (সা) ভ্রমণপথে অসংখ্য আশ্চর্য ঘটনা ও কর্মকাণ্ড দেখে আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া ও প্রশংসা করেন। উর্ধ্বাকাশে রাসূল (সা), আদম (আ), ঈসা (আ), ইয়াহইয়া (আ), ইউসুফ (আ), ইদ্রিস (আ), হারুন (আ), মুসা (আ), ইব্রাহিম (আ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর নিকট হাজির হন। কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে, অতঃপর তিনি নিকটবর্তী হলেন, তাদের মধ্যে ধনুকের দুই মাথায় ব্যবধান রইল অথবা আরো নিকটে। তখন আল্লাহ তার বান্দার প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন যা করার ছিল। এই রাতেই আল্লাহ উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেন।

সঠিকভাবে নামাজ সংরক্ষণের মাধ্যমেই আমরা মিরাজের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারব। মূলত, নামাজ দ্বীনের খুঁটি এবং ইসলামের মূল ভিত্তি। যে সঠিকভাবে নামাজ সংরক্ষণ করবে সে তার দুনিয়া আখিরাত হেফাজত করল।

যে ব্যক্তি নামাজের সংরক্ষণ করবে অর্থাৎ যথাযথভাবে নামাজ আদায় করবে কেয়ামতের দিন তা তার জন্য নূর, দলিল ও মুক্তির উপায় হবে।

পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ

সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ হিসেবে আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো আল্লাহর ইবাদত করা, পিতা-মাতার প্রতি সুন্দর ব্যবহার করা, তাদের অনুগত থাকা, কোনো ভাবেই তাদের মনে কষ্ট না দেয়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, কোনো কিছুতেই তার শরিক করো না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর।' (সূরা নিসা, আয়াত-৩৬)

'আমি নির্দেশ দিয়েছি মানুষকে, তার পিতা মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার জন্য।' (সূরা আহকাফ, আয়াত-১৫)

'পিতা-মাতার মধ্যে যে কোনো একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হন তাদের সঙ্গে সদাচরণ কর এবং কখনো উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না। তাদের সঙ্গে নম্রভাবে কথা বল এবং বল হে আল্লাহ, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর যেমন করে আমাকে তারা শৈশবে লালন পালন করেছেন।' (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ২৩-২৪)

আল্লাহ বলেছেন, 'তুমি আমার এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অবশেষে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। (সূরা লোকমান, আয়াত- ১৪)

পিতা-মাতা সন্তানের জন্য অসীম ত্যাগ স্বীকার করেন। সন্তানের সুখের জন্য তারা পরিশ্রম করেন নিজের সুখকে বিসর্জন দেন। পিতা-মাতার কাছে সন্তানের যে ঋণ তা কিছুতেই পূরণ হওয়ার নয়। প্রত্যেক মা তার সন্তানের জন্য যে কষ্ট ভোগ করেন তার কোনো তুলনা নেই। কল্যাণকামী সমাজ গড়তে হলে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা সন্তানের মধ্যে যে কৃতজ্ঞতাবোধের উন্মেষ ঘটায় তা তাদের সর্বক্ষেত্রে বিনয়ী ও কৃতজ্ঞ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

পিতা-মাতা অসুস্থ হলে তাদের সেবা করা, তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা, তাদের মনে কষ্ট না দেয়া, তাদের চাওয়া-পাওয়া পূরণ করা আমাদের কর্তব্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে পিতা-মাতার বাধ্য অনুগত সন্তান হিসেবে তাদের খেদমতে আমাদের কবুল করে জান্নাতের মেহমান বানিয়ে দিন।

নিয়তি

মাহমুদুল হাসান সুমন
কলেজ নম্বর : ৯১৭১
শ্রেণি ও শাখা : দ্বাদশ-চ (দিবা)

ফেরার পথে সেই লোকটাকে দেখতে পেলাম। উসখুস চেহারায় জবুথবু হয়ে– পুকুর ধারটার পাশে রাস্তা থেকে যে তালগাছটা দেখা যায়, তারই নিচে বসে আছে। বয়স খুব বেশি হলে চল্লিশ। কিন্তু চেহারায় যে ভাব ফুটে উঠেছে তাতে যে কেউ বলবে– 'বুড়োর বয়স ৬০ ছুঁইছুঁই করছে।' আমি ডাক দিলাম,

–ও সতীনাথ!

লোকটা পাশ ফিরল। আমাকে দেখেই ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো।

- তা মশাই। এত সাজগোজ করে কই যাচ্ছেন?

- কেন? আজ না ঈদের দিন! ভালো মন্দ কেউ কিছু দেয়নি?

সতীনাথের চোখ ভিজে ওঠল। বিষণ্ণ গলায় বলল,

- দুই দিন ধরে দুই মুঠো ভাত পাইনে.... আবার ঈদের দিন? এসব দিন আর স্মরণে রয়?

পকেট থেকে ১০০ টাকা দিয়ে বললাম, 'কিছু খেয়ে নিও!'

এর বেশি কিছু করতে পারলাম না, এত মানুষের ভিড়ে। তাকিয়ে দেখলাম....সতীনাথ খাবার কেনার জন্য প্রায় দৌড়াতে শুরু করেছে, একটা ১০০ টাকার নোট শক্ত করে চেপে ধরে। আমার চোখে জল এলো। এমন আরেকটি দিনেও আমার চোখে জল এসেছিল।

সতীনাথের একটা পরিবার ছিল। মধ্যবিত্ত সুখী পরিবার। যেখানে অভাব আর না পাওয়ার কষ্ট ভালোবাসা দিয়ে পূরণ করা হয়। সতীনাথের এক সময় বাড়ি ছিল, অর্থ ছিল প্রচুর। হঠাৎ এক বর্ষায় পদ্মার বুকে মিশে গেল তার ঘরবাড়ি, আবাদি জমি। ভোর হলে সতীনাথ দেখে তার ছোট ছেলেটা পানিতে মরে ভেসে আছে। এরপর থেকে এক বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছে তার পরিবার। মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে কাজ করে কখনো দুমুঠো ভাত খায়, কখনো করে উপবাস।

নিম্ন মধ্যবিত্ত নামে কিছু মানুষ আজীবন বেঁচে থাকে খেয়ে না খেয়ে। এরা না খেয়ে থাকলেও কখনো নিয়তিকে দোষ দিয়ে ভিক্ষা করতে পারে না। বেঁচে থাকতে চাওয়ার সত্তাটা বারবার খুন হয় এদের আত্মসম্মানের হাতে।

'জানেন মশাই? একদিন বস্তিতে ঘর বানানোর একটা কাজ পাইলাম। কাজটা পাইয়ে মনে কি যে খুশি লাগতেছিল। কাজ কইরা বিকেলে বাড়ি ফিরতে যাইয়া মোড়ের পাশে হঠাৎ শুনলাম বাজতেছে, 'এসো হে বৈশাখ... এসো এসো।' মনটা চড়াৎ করে উঠল। বড় ছেলেডা একবারও বলে নাই, 'বাপ নতুন কাপড় লাগত।' আচ্ছা মশাই, ছেলেডা কি বুঝতে পারছে যে পৃথিবীর সব দিন সব মানুষের জন্য না? জানেন, যখন ছোড ছিলাম, তহন বাপে এই দিনে কত কিছু কিন্না দিত, কাপড়, জুতা, রসমালাই, কত কী? আর মায়ে কত পিঠা বানাইত। পোলাডারে আজ কিছু দিবার পারি না। নিজেরে নেড়ি কুত্তার চেয়েও অধম মনে হয়।

আমি নিশ্চুপ হয়ে সতীনাথের স্মৃতিচারণের সময় চকচকে চোখ কিংবা আক্ষেপের সময় হাউমাউ করে কাঁদার দৃশ্য দেখি। কিছু মানুষকে বোধহয় স্রষ্টা শুধু আক্ষেপ নিয়ে দেখে যাওয়ার জন্যই পাঠিয়েছেন।

সেই দিন বাড়ি ফিইরা পোলারে বললাম, 'বাপ কাপড় লাগব?' আইজ না পহেলা বৈশাখ? পোলা কাইন্দা কাইন্দা কইল, না বাবা, লাগত না। মায়ে মরার সময় কইল, আজ থাইকা তোর বাপই তোর বাপ-মা। তোর বাপেরে দেইখা রাখিস। আর তোর লাইগা আমি সাধ কইরে নতুন কাপড় কিনছি। ওইটা দেইখে আমারে মনে করিস... বাপ! –ওই কাপড়ডাই আজ পরমু বাপ।'

ওই বৈশাখের রাইতেই ওর মা মরল। আকাশে ফকফকা জোছনা। আমারে কইল 'পোলাডারে দেইখা রাইখ।' আমি কইলাম, 'হ! আমার কিছু নাই, দুঃখ নাই, চান্দের মতো একটা পোলা আছে, ওই আমার সব!' তারপর খেয়ে না খেয়ে এই আছি কোনো রকম।

সতীনাথের গল্প এতটুকুই।

ঝাপসা চোখে সতীনাথের দিকে তাকিয়ে আছি। আর মন বলছে, আজ যে দিবস/ পহেলা বৈশাখ/ কিংবা ভ্যালেনটাইন ডে কিছু মানুষের কাছে শুধুই একটি উৎসবের উপলক্ষ। পুরো বছরের প্রতিটি দিন যাদের উৎসব, যাদের চাওয়া প্রচুর টাকা, কিংবা মেয়ে হলে প্রচুর সাজগোজ বা বন্ধুদের সাথে আড্ডা, তারা সতীনাথকে চেনে না... সতীনাথের গল্পগুলো জানে না।

এরা টাকা খরচের জন্য মাধ্যম খুঁজে খুঁজেই মহাব্যস্ত। অথচ কেউ আবার ভাবে আজকের বৈশাখের দিন না আসলে, দিনটার খাবারের কথা চিন্তা করতে হতো না। সতীনাথের চোখেও আকাশে রুপার থালার মতো ঝলমলে চাঁদ ওঠে, ফিনিক ফোটা জোসনায় ভেসে যায় চরাচর কিংবা অঝোর বর্ষায় ভিজতে হয় কাজের জন্য। কিন্তু এদের সৌন্দর্য উপভোগ করা কখনো হয় না। এভাবে সতীনাথের মতো মানুষগুলো অবহেলিত থেকে যায়। সারা জীবন, কেউ তাদের গল্প শুনতে আগ্রহী হয় না। কেউ-বা আবার নাটকের চেয়েও নাটকীয় মধ্যবিত্তের গল্পগুলো শুনে শুধু আবেগ-আপ্লুতই হয়। কোনো দিন সতীনাথের হাতটা ধরতে এগিয়ে আর যায় না।

বঞ্চিতের অধিকার

শাহরিয়ার শোভন
কলেজ নম্বর : ৯৮২৮
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-ঘ (দিবা)

এ দেশে আজ প্রকৃত মানুষের বড় অভাব। শুধু শিক্ষিত হলেই কি মানুষ হওয়া যায়? জাতির কাছে আজ এই একটাই প্রশ্ন। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। দান করেছেন প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। বুদ্ধি-বিবেক তো শুধু মানুষেরই আছে। তবুও কেন আজ মানুষ এত নিষ্ঠুর! লোক দেখানো বড় বড় ডিগ্রির মূল্য কি মনুষ্যত্বের চেয়েও বেশি! মানুষ শিক্ষিত হচ্ছে কেবল নিজস্বার্থে। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য তো তা নয়। মনুষ্যত্ব অর্জনই তো শিক্ষা লাভের আসল উদ্দেশ্য। আজ চোর চুরি করছে, ভিক্ষুক ভিক্ষা করছে। কেউ একটিবার তাদের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে না। চুরি করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে পরিগণিত হয়, ভিক্ষাকে অনেকে বলেন স্বভাবের দোষ। আসলেই কি দোষটা শুধু চোর বা ভিক্ষুকের! না, দোষটা তাদের নয়। দোষটা আমাদের এই শিক্ষিত ধনী সমাজের। ধনীদের সম্পদে তো এই মানুষগুলোর ভাগ রয়েছে। তারা অনাহারে কষ্টে জীবনযাপন করে। যখন অন্ন জোগাড়ের সব পথ বন্ধ হয়ে যায়, তখন তারা বাধ্য হয় চুরি করতে, ভিক্ষা করতে। চোরের শাস্তি দেয়ার আগে যাচাই করতে হবে সে কেন চুরি করেছে। অন্ন জোগাড়ের সব পথ বন্ধ হয়ে যায়, তখন তারা বাধ্য হয় চুরি করতে, ভিক্ষা করতে। চোরের শাস্তি দেয়ার আগে যাচাই করতে হবে সে কেন চুরি করেছে। যদি সমাজের এই বঞ্চিত মানুষগুলো তাদের অধিকারটুকু পেত তবে তাদের এ অবস্থা হতো না! সমাজে আরো কত বঞ্চিত মানুষ রয়েছে তার হিসাবও কেউ রাখে না। কেউ কেউ অভাবের তাড়নায় নানা খারাপ কাজও করে থাকে। তা ছাড়া রয়েছে কত শ্রমজীবী মানুষ। এদের অনেক শিক্ষিত অমানুষ বা মনুষ্যত্বহীন মানুষ নিম্নশ্রেণির মানুষ বলে আখ্যায়িত করেন। সৃষ্টিকর্তা সব মানুষকে সমান হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের আবার উঁচু-নিচু শ্রেণি হয় কীভাবে! সব ধরনের ভেদাভেদ এই উঁচু শ্রেণির অমানুষেরই সৃষ্টি। অনেকে মনে করবেন এই লেখনীতে রসকষহীন বাক্যগুলো পড়লে হয়তো কারো উপকার হতে পারে, আবার নাও পারে। দেশের এই বিশৃঙ্খল পরিবেশ নিশ্চয়ই সব বিবেকবান মানুষকে নাড়া দেবে। সবাইকে এই মায়ার জগৎ ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেবল নিজের স্বার্থে সব কিছু করলে জগতের কল্যাণ সম্ভব নয়। যদি ওই সব বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজে থাকা যায় তবেই দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধিত হবে।

মোট কথা, কেবল স্বার্থ চিন্তা না করে যদি সমাজের সবার মঙ্গলের চিন্তা করে জীবনে কিছু করা যায়, তবে জাতিরও লাভ, নিজেরও লাভ। সুখে-শান্তিতে থাকতে কে না চায়! কিন্তু কেবল নিজের সুখের চিন্তা করলেই তো আর সুখ পাওয়া যায় না। সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের কল্যাণ সাধন প্রয়োজন। যদি সমাজের সবার মধ্যে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সম্প্রীতি থাকে তবেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষে মানুষে হানাহানি, কাড়া, বিবাদ এসব বন্ধ না করতে পারলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সমাজের বিশৃঙ্খলার মূল কারণ হলো স্বার্থ চিন্তা। নিজ স্বার্থ চিন্তা না করে যদি মানুষ সমাজের মানুষগুলোর কল্যাণের কথা চিন্তা করত তবে সমাজের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতো। থাক, আর নাই বা বললাম। কথাগুলো কারো কাছে খারাপও লাগতে পারে আবার ভালোও লাগতে পারে। যাই হোক, কথাগুলো থেকে আমরা ভালো দিকগুলো নেয়ার চেষ্টা করব। কেবল স্বার্থ চিন্তা না করে সমাজের সবার জন্য চিন্তা করাটাই মঙ্গলের। তাই মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হলে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। তবেই প্রকৃত মানুষ হওয়া সম্ভব।

হাউজের জীবন

এস এম তৌশিফ উদ্দিন চৌধুরী
কলেজ নম্বর : ১৫১০৩৪৪
শ্রেণি ও শাখা : ৫ম-গ (প্রভাতি)

- এ ওঠো ওঠো ওঠো মর্নিং পিটি।

এই কথা দিয়েই শুরু হয় আমাদের প্রতিদিনের জীবন। এই কথাটি খারাপ লাগলেও কথাটিতে কেন জানি না মনে হয় মধু মাখা। রোজ ভোরে শফিক ভাই রুমে আসেন। তার চিৎকার শুনেই সবাই এক লাফে ঘুম থেকে ওঠে। উঠে ঘুম ঘুম চোখে হাঁটতে থাকি টয়লেটের দিকে। এক আঁজল জল মুখে দিতেই, ঘুম কোথায়? ও..... ঘুম ভেঙে গেল। ওজু করে রুমে এসে ফজর নামাজ পড়ি। এ সময় আরেক যন্ত্রণা। বন্ধুরা খালি নামাজে হাসানোর চেষ্টা করে। না হাসলেই ভালো।

তারপর যাই মাঠে। পিটি স্যাররা বাঁশি দিলেন। যাই। দেখি কী করাবে আজ। জগিং নাকি দৌড়। খেলা নাকি এক্সারসাইজ। যেটাই হোক।
-আয়! হায়! আজকে এক্সারসাইজ। মরছি।
স্যার বললেন,
- 'সোজা হবে সোজা হপ্।'
তার এই কমান্ড শুনলে সবাই হাসে। কারণ, তিনি কমান্ডের শেষে 'হো' না বলে 'হপ্' বলেন।
তাই!
মর্নিং পিটি শেষ হলো।
অন্য জগতে চলো :
- ৮টায় স্কুল শুরু। বাজে ৭টা ৫০। এখন কী করি। (স্কুলে যাওয়ার পর এবং তখন ৮টা ১০ বাজে)
- 'স্যার, ম্যা আই কাম ইন।'
- 'ইয়েস কাম ইন। লেট কেন?'
- 'স্যার, ডাইনিং দেরিতে হয়েছে।'
তখন কোনোমতে বেঁচে গেলাম।
(দুপুর ১২টা ৪০) স্কুল ছুটি হলো। হোস্টেলে চলে গেলাম। যাওয়ার সাথেই দুপুরের খাবার।

(প্রায় ৩টার দিকে) বাথরুমের একটি অন্য রকম মজার কথা। Water fight. নামটা অচেনা মনে হতেই পারে। এটা একটা খেলা। এই খেলা পানি নিয়ে। যে যাকে পারে পানি মারে। কারোর নাকে, কানে, চোখে পানি ঢুকে। তাও অনেক মজা লাগে।

বিকেলের গেমস, সন্ধ্যার মাগরিবের নামাজ শেষ। এখন পালা Night Class-এর। জানি না কে আসবেন। কোনো ভালো স্যার না রাগি স্যার। না ম্যাডাম এলেই ভালো। ম্যাডামরা একটু কম বকেন।
(Night Class-এর সময়)
- দোস্ত, ম্যাডাম কই?
- কেন বাইরে
- ও! দোস্ত চল ওয়ার্ডগেম খেলি।
- নারে দোস্ত। চল রসকষ খেলি।
- ইস্ বোরিং।
- ধুত্! খেলবই না।
(ম্যাডামের প্রবেশ এবং উচ্চস্বরে বললেন....)
- এই, পড়াশোনা কিছু কী নেই। খালি গল্প।
Night Class শেষ। ঘুমিয়ে পড়ব। তোমরা আমায় ভুলো না।
এটা আমার হোস্টেলের প্রতিদিনের জীবন কাহিনী।

দীনু

আহ্‌নাফ ফুয়াদ খান
কলেজ নম্বর : ৮০৫৩
শ্রেণি ও শাখা : ষষ্ঠ-ক (দিবা)

দীনু আমাদের কাজের ছেলে। ওর বাড়ি নওগাঁ। কিন্তু ও আমাদের বাসায়ই থাকে। দীনু আমাকে ভাইয়া ডাকে। মাকে ডাকে খালা আর বাবাকে ডাকে খালু। আমাদের বাসায় এক রুমে থাকি আমি, এক রুমে আমার মা-বাবা আর আরেক রুমে দীনু। দীনুর পড়ালেখা করার খুব শখ। ও বয়সে আমার ছোট, তাই আমি ওকে আমার পুরান বইগুলো পড়তে দিই। ও অবসরে পড়ে, না হয় আমার সাথে খেলে। খেলাধুলায় সে বেশ ভালো।

একদিন রাতে আমার ঘুম আসছিল না। তাই খুব বোরিং লাগছিল। ভাবলাম 'দি গ্রেট নেলসন ম্যান্ডেলা' পড়ব। (তবে বইটা আমার নিজের লেখা)। পরে ভাবলাম, দীনুর সাথে একটু দেখা-সাক্ষাৎ করে আসি। দীনুর রুমের দরজা খুলে দেখি সে আরামসে ঘুমাচ্ছে। আমি দীনুর কাছে গিয়ে বলি, 'এই দীনু, ওঠ, ওঠ। আরে দীনু ওঠ।' দীনু আমার কথা শুনছে না বলে মনে হয়। তাই আমি ওর রুমের দরজাটা অফ করে ওর কানের কাছে গিয়ে জোরে একটা তালি মারি। ও সাথে সাথে উঠে বলা শুরু করে, 'ওরে বাবা! বোম ফুটল রে! মাইরা গেলাম রে!! আমি বলে উঠি, 'আরে দীনু, আস্তে, আমি ফুয়াদ।' ও আবার বলে, 'ও ভাইয়া। তুমি, আমি ভাবছিলাম বোম ফুটছে।' আমি আবার বললাম, 'বোম ফুটলে তুই বাঁচতি নাকি?' ও বলে, 'ঠিক বললেন ভাইয়া। এমনে আপনি এত রাতে এখানে কেন? ঘুম আসছে না নাকি?' আমি বললাম, 'ঘুম আসছিল না। তোরে জ্বালানোর পরে অনেক ঘুম আসতেছে। আমি যাই।' দীনু বলে, 'কিন্তু আমার ঘুম যে হারাম করে দিলা, তার কী?' আমি বললাম, "বসে বসে 'আমার বন্ধু রাশেদ' পড়। এসে যাবে।" এই বলে আমি আমার বেডরুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

পরের রাতে একই ঘটনা, আমার ঘুম আসছিল না। ভাবলাম আগের আইডিয়াটা কাজে লাগাব। আমি যেই না দীনুর দরজা খুললাম ঠিক তখন দেখি এক রক্তাক্ত হাত। আমি তো দেখেই চিৎকার দিয়ে উঠলাম। সাথে সাথে মা-বাবা উঠে এসে বলেন, 'কী হলো?' সাথে সাথে জোরে হাসতে হাসতে বের হয়ে আসে ওই পটকু শয়তান দীনুটা। ও বলে, 'ভাইয়া আমার কাজ-কর্ম কেমন লাগল? আমি জানতাম তুমি আজকেও আমার ঘুম হারাম করতে আসবা। এই জন্য আমি এই কাজ করছি।' আমি বললাম, 'ব্যাটা, এই তোর কাম, দাঁড়া, আজ থেকে তোর সাথে খেলব না, বইও পড়তে দিব না।' তখন মা বলেন, 'থাক না, ও তো আমাদের পরিবারেরই একজন। ওকে কিছু বলো না। ওরও তো মজা করতে ইচ্ছা করে, ও তো আমাদের মতোই মানুষ। তবে কাল রাতে কী হয়েছিল?' দীনু কিছু বলার আগেই আমি বলি, 'অনে...ক লম্বা কাহিনী। সকালে বলব নি, এখন ঘুমাতে চলো।' এভাবেই দীনু আমাদের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠে।

ঘুরে এলাম পাথর রাজ্যে

ওয়াসি আরহাম
কলেজ নম্বর : ৮০১১
শ্রেণি ও শাখা : সপ্তম-ঘ (দিবা)

আমি বেড়াতে খুব ভালোবাসি। গত ঈদের ছুটিতে আমি আমার পরিবারের সাথে বেড়াতে গেলাম সিলেট। আমরা যাত্রা শুরু করি ২৭ জুন ২০১৭-তে। দিনটি ছিল খুবই চমৎকার। আমরা একটি গাড়ি ভাড়া করে রওনা নিলাম সিলেটের উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যায় আমরা সিলেট পৌঁছলাম। সকলে খুবই ক্লান্ত থাকায় আমরা PDB (Power Development Board)-এর রেস্ট হাউজে বিশ্রাম নেই। সিলেটের বিখ্যাত 'পাঁচ ভাই রেস্তোরাঁয়' আমরা রাতের খাবার খেয়ে রেস্ট হাউজে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন সকাল ৮টায় আমরা বিছানাকান্দি নামক জায়গার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। রাস্তার দুই পাশে দূরে নীল নীল পাহাড় আর তার মাঝে ছোট ছোট ঝরনা। দূরের সাদা সাদা মেঘগুলো যে চাদরের মতো জড়িয়ে রেখেছিল পাহাড়গুলোকে। বাবার কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম পাহাড়গুলো আমাদের দেশের নয়। ভারতের মেঘালয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। অনেক্ষণ পর আমরা একটি নদীর ঘাটে পৌঁছলাম। আমরা একটি ট্রলারে করে প্রায় আধ ঘণ্টা মনোরম সুন্দর এই নদীর ভেতর থেকে যাত্রা করে বিছানাকান্দি পৌঁছলাম। এই অনন্য এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যেন চোখ জুড়িয়ে আসল। চারদিকে শুধু পাথর আর পাথর। রঙ-বেরঙের নানান আকৃতির লাখ লাখ পাথর। কোনোটি বড় কোনোটি ছোট। কোনোটি কমলা, সাদা ও হলুদের মিশ্রণ যুক্ত। কোনোটি কালো কোনোটি সাদা, কোনোটি বা সবুজ, নীল। এগুলো দেখে আমার চোখ জুড়ালো। এখান থেকে একটি ঝরনা দেখা যায়, যা দুটি পাহাড়ের মাঝখান থেকে ঝরছে। যা আমরা দেখেছিলাম এই দর্শনীয় স্থান একেবারে বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেঁষে অবস্থিত। এখানে এসে আমরা যে যার মতো ছবি তুলতে লাগলাম। এখান থেকে আমরা অনেক পাথর তুলে নিলাম। সেখানেই এক ভ্রাম্যমাণ হোটেলে আমরা সবাই অনেক আনন্দ করে খাবার খেলাম। এরপর বিকেলের দিকে ট্রলারে চড়ে নদীপথে আমরা ফিরে আসছিলাম। আমার কিছুতেই আর ফিরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। চারপাশে পাহাড়ঘেরা পরিবেশে সূর্য ডোবার দৃশ্য ছিল অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। অবশেষে আমরা চললাম ঢাকার পথে। আমি পাথর রাজ্য অর্থাৎ বিছানাকান্দির মনোরম দৃশ্য ভুলব না। এখানে এসে কবির মতো আমারও মনে হয়েছিল, 'সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।'

দেশটা আমার

মৃণাল সাহা নয়ন
কলেজ নম্বর : ৬৯২৫
শ্রেণি ও শাখা : অষ্টম-খ (দিবা)

আমি নিজে মোটামুটি গড়পড়তা ধরনের বাঙালি। যুক্তি, প্রেম, ভালোবাসা, আশা নিয়ে বেঁচে থাকা একজন মানুষ। একজন তনুর জন্য শাহবাগে চোখ ভেজাই। আবার মুস্তাফিজ স্ট্যাম্প উড়িয়ে দিলে 'বাংলাদেশ' বলে লাফিয়ে উঠি। গাছ নিয়ে যখন কোনো বিজ্ঞানী কিছু আবিষ্কার করেন, তখন ভাবি গাছের প্রাণ আছে এটাও আমাদের বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর আবিষ্কার। বাংলাদেশের জাহিদ হাসান যখন তার আবিষ্কার দিয়ে বিশ্ব কাঁপান, সেই ছবি ফেসবুকে শেয়ার দিয়ে লিখি 'বাংলাদেশি' হয়ে আমি গর্বিত। আবার কোনো দুর্নীতিবাজের কথা শুনলে 'মাইরা ফেলি' সত্তাটাও জেগে উঠে।

দেশটা নিয়ে না খুব আশাবাদী। দুর্নীতি, হলমার্ক, শেয়ারমার্কেট কেলেঙ্কারির চাইতে পদ্মা সেতু হচ্ছে এটাতেই আমার গর্ব। লুটপাট, সন্ত্রাসের দেশের মাঝেও একজন পুলিশ যখন কাউকে সাহায্য করে, ২১ দিন পর শিশুকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেয় সেটা শুনে মায়া লাগে। বড় বড় সাংবাদিক যখন 'জয় বাংলা' বলে কেঁদে দেন। খালেদ মোশাররফ, রুমীদের বীরত্ব, বঙ্গবন্ধুর উনিশ মিনিটের ভাষণ শুনে মনে হয়, বাংলাদেশে জন্মে ভুল করিনি। যখন দেখি সৎ পুলিশ অফিসারটা সন্ত্রাসী ধরছেন, মেয়েদের শিক্ষার হার বাড়ছে, সাকিব অশ্বিনকে টপকাচ্ছেন, ফুটবলে মেয়েরা সাফল্য আনছেন, তখন বুকের বামপাশে হাত দিয়ে বলি বাংলাদেশ এগোচ্ছে। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরের মতন না, বাংলাদেশ বাংলাদেশের মতো এগোচ্ছে।

আমি বাংলাদেশি, আমার দাদা এখানে ধান বুনেছেন। বাবা-মা সাঁতার কেটেছেন, আর আমি এই ছায়ায় বসে ভাবি, বাংলাদেশ নিয়ে। দেশটা যে আমার। আবেগটা আমার, কারণ আমি বাংলাদেশি। ইউরোপ, আমেরিকা আমার হতে পারে না, তবে এটুকু জানি, দুনিয়ার কোনো দেশ ভাষার জন্য রক্ত দেয়নি, রাস্তার অপরিচিত লোককে অসুস্থ দেখে ভাই ভাই করতে করতে হাসপাতালে দৌড়ায়নি, খালি হাতে রানা প্লাজা থেকে মানুষ উদ্ধার করেছে কিনা, জানা নেই। অন্য কোনো দেশ একটা দেশ হেরেছে বলে না খেয়ে থেকেছে কিনা, একজন লোকের একটা খেলা থেকে বিদায়ে হুহু করে কেঁদেছে কিনা জানা নেই। কেউ প্রথম প্রেমিকাকে ভুলতে না পেরে চিরকুমার থেকেছে কিনা, কোন দেশে নাড়ির টানে ২০০০ জনের ট্রেনে ৭০০০ মানুষ ঝুলতে ঝুলতে বাড়ি ফিরেছে দেখাতে পারবেন? কোন দেশে মা তার শহীদ ছেলের জন্য রেললাইনে, ভাত খেতে পায়নি বলে ভাত না খেয়ে ৪৩ বছর কাটিয়েছে জানেন? আমি জানি, সব এক দেশেই হয়। যে দেশে সবুজ পতাকার মাঝে লাল সূর্য আছে, যে দেশের জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম দুটি লাইন,

'আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালোবাসি।'

আমি এক রেমিয়ান বলছি

এইচ এম নাফিস সাদিক
কলেজ নম্বর : ১৫৫২৭
শ্রেণি ও শাখা : নবম-গ (প্রভাতি)

আমি আর সাব্বির, 'একই বৃন্তে দুটি ফুল'– এ উপমা আমাদের ক্ষেত্রেও খাটে। দুজনে ছিলাম পিঠাপিঠি, একই সত্তার অধিকারী– তবুও মানুষের তৈরি সম্পর্কে সাব্বির ছিল আমার চাচা। বয়সে কিছুটা বড় হলেও ও আমার সাথেই পড়ত। স্কুলে যাওয়া-আসা, সাকিব-মুশফিকদের মাঠের দাপট, আর্জেন্টিনার বারবার তীরে এসে তরী ডোবা দুজনে একসাথেই উপভোগ করতাম। প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক পেরিয়ে জেএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। ফলাফল দুজনেরই খুব ভালো। আমার যেমনি স্বভাব তেমনি কাজ। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম এই স্কুলে আর পড়ব না। ভর্তি হব ঢাকার কোনো নামকরা কলেজে। আমি জানতাম আমি ঢাকা চলে গেলেও ও এখানেই থাকবে। হয়তো-বা তখন কোনো কিছু আমার উপর আছর করেছিল বলেই একবারও ভাবিনি ওকে ছেড়ে ঢাকা গিয়ে থাকতে পারব তো! যাই হোক আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমাকে তা ভাবায়নি। কিছু দিন পর বাবাকে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলাম। পরিবার থেকে আমার সিদ্ধান্তের পক্ষে রায় এলো। ফরমপূরণ করা হলো ঢাকার নামকরা সব কলেজে। চলে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ; চান্স পেয়েছি ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে। হয়ে গেলাম এক নব্য রেমিয়ান। থাকব কলেজের হোস্টেলে। হোস্টেলে ওঠার তারিখও ঠিক হলো। মাঝে কিছু দিন বিরতি। ভাবলাম বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। পুরোটা সময় বন্ধুদের সাথে কাটালাম। সাব্বিরকে নিয়ে একসাথে ঘুরলাম, খেলাম আরো কত কি।

সে দিন ছিল ২৬ ফেব্রুয়ারি। বাড়ি থেকে বিদায়ের দিন। কিছুক্ষণ পরই ছেড়ে যাব চিরপরিচিত জায়গাটি। হয়তো বা আর কখনো প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসে এই বাড়ির ঠিকানা লিখব না। রাত ৮টায় লঞ্চ। বাড়িতে গাড়ি এসে গেছে। গোছগাছও প্রায় শেষ। এবার বিদায়ের পালা। আমার সঙ্গে যাচ্ছেন মা। বাবা পরের দিন ঢাকাতে আসবেন। এখন আপাতত গন্তব্য ঢাকাতে খালার বাসা। বিদায়পর্ব শুরু হলো। এক এক করে সবার কাছ থেকে দোয়া নিচ্ছি। সবার মুখ কেন জানি কালো কালো মনে হলো। আবিষ্কার করলাম আমার মুখও কালো হতে শুরু করেছে। এ যাত্রায় শোকের জন্য দায়ী হরমোনদের বোধ করি আটকাতে পারলাম। ম্রিয়মাণ আমি আবার কঠিন হয়ে পড়লাম। কত কত দোয়া পাচ্ছি, সঙ্গে উপদেশ বাণী– ঠিক মতো খাবি, ঠিক মতো ঘুমাবি, শালা কইলে ভাই কইবি আরো কত কি।

গাড়িতে উঠব এই মুহূর্তে মনে হলো সাব্বিরের সাথে তো কথা হলো না। কিন্তু ওকে তো খুঁজেও পাচ্ছি না। কোথায় গেল ও? ঘরে ঢুকে দেখি বিছানার এক কোণে বসে ও অঝোরে কাঁদছে। এক ঐশ্বরিক শক্তি আরো একবার আমার উপর আছর করল। আমার কঠিন হৃদয় আজ তরলে পরিণত হলো। চোখে জল এলো; কিন্তু এক ফোঁটাকেও বশ করতে পারল না অভিকর্ষ শক্তি। ঐ দিব্য শক্তি আমার চোখের জল চোখেই রেখে দিল আর আমার তরলে রূপান্তরিত হৃদয়কে টেনেহিঁচড়ে বের করে দিতে চাইল। মন চাইছিল এই ভর্তি ফরম, বেতন রশিদ সব ছুড়ে ফেলে দিই। আমি তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ম্রিয়মান। মনে হলো কোনো এক গোলক-ধাঁধায় আটকা পড়ে গেছি আমি। হয়তো কোনো দিন বেরোতে পারব না এই নির্মমতা থেকে। ততক্ষণে ও দাঁড়িয়ে পড়েছে। লাফ দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওকে। যেন মুমূর্ষু আমাকে কেউ এক পিপে অমৃত দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করাল। এক সময় আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। বাইরে কোলাহল শুরু হয়ে গেছে– কীরে লঞ্চ তো ফেল করবি!

গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি চলতে শুরু করল। পেছন ফিরে তাকিয়ে রইলাম। অল্পক্ষণ পরেই আবারো বিচ্ছিন্ন হলাম সব্বিরের থেকে, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের থেকে, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা থেকে, আমার স্বপ্নপুরী থেকে।

এক রেমিয়ান হওয়ার জন্য কত ত্যাগ, কত তিতিক্ষা, কত দূরত্ব, কত চোখের জল।
জয় হোক রেমিয়ানদের, জয় হোক ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের।

কুয়াকাটা ভ্রমণ

সৌমিক সাহা অর্ণব
কলেজ নম্বর : ৬৫০৯
শ্রেণি ও শাখা : নবম-প (দিবা)

২৯ জানুয়ারি, ২০১৭ আমার জীবনের একটি অবিস্মরণীয় দিন। যে দিন আমার এবং আমার শিক্ষকবৃন্দের পরিবার ভ্রমণ করেছিলাম বাংলাদেশের বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটা। দুপুর ২টার সময় একটি বাস সকল যাত্রীকে নেয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের দ্বিতীয় গেটের সামনে এসে থেমেছিল। আমাদের কলেজের নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষক তাদের পরিবারসহ ভ্রমণটিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সকলেই ভ্রমণটিকে করে তুলেছিলেন আনন্দময়। বাসটি আমাদের বিকেল প্রায় পৌনে ৫টার দিকে বরিশাল টু পটুয়াখালী লঞ্চ টার্মিনালে পৌঁছিয়ে দিয়ে যায়। সকল শিক্ষক তাদের প্রয়োজনীয় ব্যাগ ও পরিবারসহ লঞ্চে উঠেন এবং নিজ দায়িত্বে তাদের রুম নিজেরা ঠিক করে নেন। সকলেই নানা রকম ক্লান্তির পর এক সাথে লঞ্চের ছাদে গিয়ে উপস্থিত হন। যে নদীতে লঞ্চটির অবস্থান তা হলো মেঘনা। সন্ধ্যা প্রায় ৬টা ১৫ মিনিটের দিকে লঞ্চ ছেড়েছিল। লঞ্চে নানা রকম খাবার দোকানও ছিল। এখান থেকে অনেকেই নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করেছেন। রাত প্রায় ৮টার দিকে লঞ্চের একটি খোলা অংশে শিক্ষকবৃন্দ এসে উপস্থিত হন। শিক্ষকবৃন্দের সন্তানাদিদের নিয়ে একটি ছোট-খাটো আসর জমিয়েছিলেন। এভাবে সময়টুকু অনেক ভালোভাবেই কেটেছিল। রাতের বেলা প্রায় অনেক শিক্ষকই ঘুমাতে পারেননি শুধুমাত্র একটি চিন্তায়, যা কুয়াকাটা যাওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। সূর্যোদয় ভোর ৫টার দিকে শিক্ষকবৃন্দের ছেলেমেয়েরা অধীর আগ্রহে ঘুম থেকে উঠে পড়েছিল। কিন্তু শীতকালীন সূর্য একটু দেরিতে উঠেছিল। সকাল পৌনে ৭টায় সময় ছিল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। অনেকেই সূর্যোদয়ের ছবি তুলেছিলেন আবার কেউ ভিডিও করেছিলেন। সকাল-সকালই আমরা পটুয়াখালীতে গিয়ে পৌঁছালাম। সেই দিন ছিল ৩০ জানুয়ারি-২০১৭। একটি বাসের মাধ্যমে সকল শিক্ষক রওনা হলেন 'হোটেল স্কাই প্যালেসে'-এর উদ্দেশ্যে। হোটেলটির সামনেই ছিল কুয়াকাটা সি-বিচ। শীতের কারণে এর পানি কিছুটা নিচে নেমে গিয়েছিল। সেই দিন দুপুর বেলায় আমরা লেবুর বাগান ভ্রমণ করেছিলাম। এটি কুয়াকাটার একটি ভ্রমণের জায়গা। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে, এই স্থানটিতে কোনো লেবুগাছ নেই। অনেকেই অনেক রকম বর্ণনা দিয়েছেন জায়গাটির নাম লেবুর বাগান দেয়া প্রসঙ্গে। সকলের বর্ণনা ছিল হাস্যরসাত্মক। এই স্থানটি নদীর চরের কাছাকাছি হওয়ায় সন্ধ্যায় আমরা সূর্যাস্ত উপলব্ধি করেছিলাম। তারপর সন্ধ্যা থাকতেই আমরা হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। তারপরের দিন ৩১ জানুয়ারি-২০১৭। এই দিন ভোর বেলায় সূর্য ওঠার আগেই অনেক শিক্ষক ভ্যানে করে সূর্যোদয় দেখার জন্য সুন্দর একটি স্থানে যান। সে দিনের সূর্যোদয়ও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে আমরা আবার হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। দুপুর হওয়ার আগেই আমরা রওনা হয়েছিলাম শুঁটকি পল্লী নামক ভ্রমণ স্থানে। এখানে অজস্র শুঁটকি মাছ, নানা প্রজাতির মাছ ঝুলন্ত অবস্থায় একটি বিশাল অঞ্চলজুড়ে রাখা হয়েছিল।

দুপুরেই আমরা রওনা হলাম টেংরাগিরি সংরক্ষিত বনের উদ্দেশে। একটি কাঠের তৈরি ছোট ব্রিজের মাধ্যমে জায়গাটিতে প্রবেশ করেছিলাম। এর একটু ভেতরেই ছিল সুন্দরবনের একাংশ। অনেক ম্যানগ্রোভও এই বনে ছিল। অনেকেই স্থানটিতে স্থানীয় দোকান থেকে কচ্ছপ ও কাঁকড়া খেয়েছিলেন। তারপর আমরা দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য হোটেলে গিয়েছিলাম। আমাদের হোটেল থেকে আবার রওনা হলাম একটি বৌদ্ধ মন্দিরের দিকে। যেখানে বুদ্ধ ভাস্কর্যটি প্রায় ৩৬ ফুট উঁচু। বিকেল সাড়ে ৫টায় পৌছালাম বৌদ্ধ মন্দিরটিতে।

বৌদ্ধ সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার পাশাপাশি দেখলাম এই ৩৬ ফুট উঁচু বুদ্ধ ভাস্কর্যটি। বুদ্ধ মন্দিরটির অদূরেই রাখাইন পল্লী। এখানে রাখাইনদের নিজ হাতে বোনা ঐতিহ্যবাহী কাপড়চোপড় বিক্রি করা হয়। এই কাপড়গুলো নিতান্তই নরম এবং সুতির, যা পরার জন্য অনেক আরামদায়ক। সন্ধ্যার দিকে আবার কেউ কেউ রওনা হয়েছিলেন কুয়াকাটার বিভিন্ন ধরনের দোকানে। আবার কেউ ক্লান্তির জন্য হোটেলে চলে গিয়েছিলেন। রাতের খাবার প্রায় সবাই রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়েছিলেন। এটিই আমাদের ভ্রমণের শেষ দিন। পরের দিন ছিল সরস্বতী পূজা। হিন্দু শিক্ষক পরিবার বলতে গেলে শুধুমাত্র আমরাই সকাল বেলায় উঠে অঞ্জলি দিতে গিয়েছিলাম এবং সেই দিন সকাল বেলায় আমরা রওনা হই ঢাকার উদ্দেশে। প্রতিটি ভ্রমণই আমাদের শিক্ষার ভাণ্ডারকে ভরিয়ে তোলে। ঠিক তেমনি এই কুয়াকাটা ভ্রমণটিও ব্যতিক্রম নয়। আমি এই জায়গাটি সম্পর্কে অনেক জ্ঞানার্জন করতে পেরেছি এবং ভ্রমণটি আমার স্মৃতিতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বই লুকানো রোগ

শিহাব খন্দকার
কলেজ নম্বর: ৯৬৭০
শ্রেণি ও শাখা : নবম-ঙ (দিবা)

আমাদের ভিআরএমসি লাইব্রেরিতে হুমায়ূন আহমেদের বই খুঁজতে গিয়ে প্রথমদিকে খুব অবাক হয়েছিলাম। এখনো হই। প্রথমদিকে অবাক হয়েছিলাম কারণ হুমায়ূন আহমেদের একটি বইও আমার চোখে পড়েনি। আর এখন অবাক হই বই লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটা দেখে। প্রথমদিকে বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পেরেছি।

ধরা যাক বুক শেল্ফ ৩৮-এ অনেক বইয়ের ভিড়ে হুমায়ূন আহমেদের একটি বইও আছে। সেই বইটি লাইব্রেরির নিয়মিত কোনো পাঠকের চোখে পড়েছে। এক রকম আকৃষ্ট হয়ে সেখান থেকে বইটি নিয়ে সে পড়া শুরু করে দিল। বই পড়ার ২০ মিনিটের মাথায় ফাইনাল বেল বেজে উঠল। তার মানে টিফিন টাইম শেষ। ২০ মিনিটে একটি বইয়ের কতটাই-বা পড়া যায়! এদিকে পাঠক বইটির প্রতি মোটামুটি আকৃষ্ট হয়েছে। কাজেই বইটা তাকে পড়তে হবে। কিন্তু লাইব্রেরির সদস্য না হলে তো আর বই নিয়ে যাওয়া যাবে না। শুধু সদস্য হলেই হবে না, বই নেয়ার জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট সময় (যেমন-নবম শ্রেণির ছাত্রদের জন্য সোমবার)। কী আর করা, পাঠক ছাত্রটি এবার বইটি রেখে ক্লাসে যাবে এবং বই নেয়ার নির্দিষ্ট সময়টির জন্য অপেক্ষা করবে। কিন্তু বইটি যদি আবারো বুক শেলফ ৩৮-এ রেখে যাওয়া হয় তাহলে পরের দিন ঐ বইয়ের আর কোনো হদিস মিলবে না– হুমায়ূন আহমেদের বই বলে কথা! তাহলে পাঠক ছাত্রটি এবার কী করবে? হ্যাঁ, উপায় একটা আছে! আর তা হলো– বইটি যদি কঠিন উপায় অবলম্বন করে লুকিয়ে রাখা যায় (এমন কোনো জায়গায় যেখানে অন্য কারো চোখ পড়ার সম্ভাবনা খুব কম), তবেই পরবর্তী সময়ে বইটি ফিরে পাওয়া যাবে। পাঠক ছাত্রটি ঠিক এই কাজটাই করল। বুক শেলফ ৩৮-এর বই সে রাখল বুক শেল্ফ ৪২-এর সবচেয়ে নিচের তাকের একটা গোপন জায়গায়। নির্দিষ্ট সময় চলে আসার পর লাইব্রেরির সদস্য হিসেবে পূর্বে নেয়া বইটি জমা দিয়ে অথবা নতুন সদস্য হয়ে হুমায়ূন আহমেদের বইটি নিতে সে সক্ষম হলো (সক্ষম নাও হতে পারে যদি কপাল খারাপ হয়)।

ইদানীং হুমায়ূন আহমেদের কিছু কিছু বই চোখে পড়তে শুরু করেছে। এর মধ্যে একটি হলো 'শ্রেষ্ঠ মিসির আলি'। লাইব্রেরির সদস্য হওয়ার পর প্রথম এই বইটিই নিতে চেয়েছিলাম। সত্যি বলতে কি, মিসির আলির বড় ভক্ত আমি– যদিও মানুষটা কাল্পনিক। 'শ্রেষ্ঠ মিসির আলি' বইটি নিয়ে স্যারের কাছে গিয়ে বললাম, 'স্যার, এই বইটা...' বইটি দেখামাত্রই স্যার ধরা গলায় বললেন, 'উঁহু! এত বড় বই দেয়া যাবে না।' 'স্যার, আমি পড়েই দিয়ে দিব।' 'না, হবে না!' কেন বড় বই দেয়া যাবে না, জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করলাম না। হতাশ হয়েই আরো বই খুঁজতে গেলাম এবং শেষমেশ হুমায়ূন আহমেদের বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী 'ওমেগা পয়েন্ট' নিয়েই ক্লাসে গেলাম। সায়েন্স ফিকশনটা পড়ে ভালোই লেগেছে– আমার পড়া হুমায়ূন আহমেদের প্রথম সায়েন্স ফিকশন। কিন্তু তখনো মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে মিস্টার মিসির আলি।

পরদিন টিফিনের ঘণ্টা পড়া মাত্র লাইব্রেরিতে গেলাম এবং খুবই অবাক হলাম যখন মিসির আলিকে পাওয়া গেল না। আমি আবিষ্কার করলাম 'শ্রেষ্ঠ মিসির আলি'-কে কিডন্যাপ করা হয়েছে। প্রায় সব বুক শেল্ফে খুঁজলাম, পাওয়া গেল না। সত্যিই তো! মিসির আলির মতো বুদ্ধিমান, রহস্যময় একজন মানুষকে আমার মতো অতি নগণ্য একটা কিশোর কিভাবে খুঁজে পাবে? এ তো প্রায় অসম্ভব!

'মিসির আলি সমগ্র' বইটি কিনতে মোটামুটি বাধ্যই হলাম– নিজের ওপর বাধ্য হওয়া যাকে বলে।

লাইব্রেরির বই লুকানোর ব্যাপারটায় আর অবাক হই না, হতাশ হই না বরং আগ্রহ বোধ করি। জুনিয়রদের বই লুকানোর দৃশ্যটা দেখলে আমাদের স্বয়ং প্রিন্সিপাল স্যারও মুচকি হাসতেন আর মনে মনে বলতেন,– 'শাবাস বেটা! এখন বই লুকোবি না তো কখন? বইকে ভালো না বাসলে কি কেউ বই লুকাতে পারে?' সত্যি বলছি– এখন আমি নিজেও পছন্দের বই লুকিয়ে রাখতে আনন্দবোধ করি।

কৃতিত্ব পিতামাতার

আহনাফ ফাহাদ
কলেজ নম্বর : ৯৫৬৫
শ্রেণি ও শাখা : নবম-ঙ (দিবা)

দৈনন্দিন জীবনের বিলাসিতার ভিড়ে আমরা সেসব মানুষকে ভুলে যাই, আমাদের সুখময় জীবন গড়ে তোলার পেছনে যাদের অবদান অপরিহার্য। আমার জীবনে এ পর্যন্ত আসার পেছনে যত অবদান, তার পুরোটাই আমার পিতামাতার। তাঁরা হলেন আমার দেখা মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্র ও গুণের অধিকারী।

আমার পিতা একজন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। বয়স তাঁর ৪৫-এর কম নয়। সংগ্রামী জীবনে তাঁকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। আমার দাদা ছিলেন একজন কৃষক। নরসিংদী জেলার সে প্রত্যন্ত গ্রামটিতে তখনো শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি। উচ্চ শিক্ষা তো দূরে থাক, প্রাথমিক শিক্ষার কথাই অনেকে ভাবতে পারতেন না। বাবা ছোটবেলা থেকেই ছিলেন পরিশ্রমী। স্রোতের টানে গা না ভাসিয়ে তিনি জীবন সংগ্রামে নেমে পড়েন। ভোর হলেই ঘুম থেকে উঠে আদায় করতেন ফজরের সালাত। এরপর ঘরবাড়ি এবং জমির কাজকর্ম সম্পন্ন করে স্কুলে যেতেন। এভাবে স্কুল ও কলেজ জীবন পার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের জন্য মহান আল্লাহতায়ালা আজ তাঁকে নিয়ে এসেছেন অনন্য উচ্চতায়। তিনি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন। আল্লাহর রহমতে তিনি একবার হজও পালন করেছেন। এখন তিনি আমাদের তিন ভাইবোনের ভবিষ্যৎ গঠনের লক্ষ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ী। তাঁর সংকল্প, আমরাও যেন বড় হয়ে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য বড় কিছু করতে পারি।

আমরা সবাই আমাদের পিতামাতার জন্য সৃষ্টিকর্তার নিকট দোয়া করব। কারণ, এ পৃথিবীতে পিতামাতার চেয়ে আপন আর কেউ নেই। তাঁদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমেই জীবনের সার্থকতা।

ওদের ও আমাদের জীবন

নুরুল আফছার
কলেজ নম্বর : ১৫৫৭৩
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-ক (প্রভাতি)

গ্রীষ্মের ছুটিতে আমাদের বন্ধুরা সবাই মিলে ঠিক করলাম ঘুরতে যাব। কিন্তু কোথায় যাব তা তখনো ঠিক হয়নি। অবশেষে সবার মতামতের ভিত্তিতে ঠিক হলো সবাই মিলে বাংলাদেশের বৃহত্তম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার যাব। তারপর আমরা সবাই মিলে দিন ঠিক করলাম এবং নির্ধারিত দিনে সবাই কক্সবাজারের উদ্দেশে রওনা হলাম। সবাই খুব আনন্দের সাথেই কক্সবাজার গিয়ে পৌঁছালাম। এবং সবাই মিলে একটা হোটেলে থাকার জায়গা ঠিক করলাম। ঐ দিন সবাই অনেক ক্লান্ত ছিলাম তাই ঐ দিন আর ঘুরতে গেলাম না। পরদিন খুব ভোরে সবাই সূর্য ওঠার দৃশ্য দেখলাম। এই দেখার অনুভূতিটা ছিল অনেক মধুর। তারপর সবাই সকালের নাস্তা শেষ করে আবার ঘুরতে বের হলাম। সবাই হাঁটতে হাঁটতে ওখানকার একটি এলাকায় গেলাম। ওখানে কিছু কুঁড়েঘর ছিল। আর পাশে ছিল একটা আর্বজনার স্তূপ। এখানে কিছু ছোট ছোট বাচ্চা কাগজ, বোতল ইত্যাদি কুড়াচ্ছে, যা দেখে আমাদের অনেক খারাপ লাগল। আমি একটা বাচ্চাকে ডাক দিলাম এবং বললাম তুমি এই নোংরা জায়গায় কী করছ? সে বলল, বোতল, কাগজ ইত্যাদি কুড়াচ্ছি। আমি বললাম এই সময় তো তোমার স্কুলে থাকার কথা, তুমি কেন এসব কাজ করছ। সে বলল এসব কাজ যদি না করি আমাদের না খেয়ে থাকতে হবে। আমি তাকে তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আমার মা ছাড়া এই পৃথিবীতে কেউ নেই। তার বাবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলে তার বাবা তার জন্মের এক বছর পর রোড এক্সিডেন্টে মারা যান। এত দিন তার মা তাকে অনেক কষ্ট করে, কাজ করে খাইয়েছে কিন্তু হঠাৎ করে তার মা অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে ভরণপোষণ করতে পারছেন না। সে বাধ্য হয়ে এই কাজ করছে। কারণ তার মায়ের ভরণপোষণ এখন তাকে করতে হবে। আমরা সবাই তার কথা শুনে অনেক কষ্ট পেলাম এবং সবাই মিলে তার মাকে দেখতে গেলাম। আর আমাদের সাধ্য অনুযায়ী তাকে কিছুটা সহায়তা করলাম। তারপর আমরা সবাই ওখান থেকে ফিরে আসলাম এবং পরের দিন সবাই ঢাকায় আসলাম। এসব মানুষের কথা আমার এখনো মনে পড়ে এবং তাদের দুঃখের কথা আমাকে অনেক কষ্ট দেয়। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি, আমরা তাদের থেকে আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আর আমার মনে হয় এসব লোকের জন্য আমরা যদি কিছু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি, তাহলে সকলে মিলেমিশে এমন একটি সমাজ গঠন করতে পারব, যেখানে মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য, হাহাকার থাকবে না, জীবন হবে সৌন্দর্যপূর্ণ।

কোথায় আছি এবং কোথায় যেতে হবে

রাকিব হাওলাদার
কলেজ নম্বর : ৯৯৮৫
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-ক (দিবা)

যে লোকটা খুব অলসের মতো জীবন কাটায়, তার সাথে তোমার কী পার্থক্য? ঠিক তার মতোই তোমার অভ্যাস। সেই একই খাবার খাও, একই জামাকাপড় পর, সেই একই রকমের আজেবাজে চিন্তা-ভাবনা কর। গতকাল যে আজেবাজে চিন্তা-ভাবনা করতে, তা আজকেও করছ। গতকাল নিজের অবস্থার জন্য ভাগ্যকে গালি দিতে, ঠিক আজকেও অন্য কাউকে গালি দিচ্ছ। কখন ঘুম থেকে উঠ? কখন ঘুমাতে যাও? কত সময় অলসতায় নষ্ট কর? টেলিভিশনে কী কী আজেবাজে জিনিস দেখ? কত সময় ফেসবুকে নষ্ট কর? আবার তুমি সাকিব বা মাশরাফি হতে চাও? পরবর্তী প্রফেসর ইউনূস হতে চাও? জাফর ইকবাল হতে চাও? হুমায়ূন আহমেদ হতে চাও? জহির রায়হান বা মুনীর চৌধুরী হতে চাও? নিজের আইডলকে ছুঁতে চাও? ইচ্ছে আছে ভালো থাকার বা ভালো কিছু করার? সফল হতে ইচ্ছে করে? নিজের জন্য বা পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য, বিশ্বের জন্য ভালো কিছু করার ইচ্ছা আছে? অবশ্যই প্রথমে স্বীকার করতে হবে যে, আমার অভ্যাসগুলোর কারণে আজকে আমি এখানে। আমার সব অভ্যাসের যোগফল আমি। আমার বর্তমান অবস্থা ছোট্ট বেলা থেকে সব অভ্যাসের ফল। অলসতায় সময় কাটানো বাদ দাও। সঠিক পথে আস। যদি নিজের উন্নতি ঘটাতে চাও তাহলে চিন্তা কর কীভাবে তুমি সময় নষ্ট কর। কী কী বদ অভ্যাস আছে তোমার? কোন কাজগুলো তোমাকে আজ এখানে নিয়ে এসেছে? কারণে-অকারণে কোন কাজগুলো তুমি করতে বাধ্য হচ্ছ? তুমিই কেবল তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পার। নিজেকে বা অন্য কাউকে অযৌক্তিকভাবে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমাদের প্রত্যেকের অসংখ্য অভ্যাস আছে। বাস্তবমুখী চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। কোথায় আছি এবং কোথায় যেতে হবে। কী কী অভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে সেখানে যেতে হলে কীভাবে পরিবর্তন করতে হবে অভ্যাসগুলো? আজকে কোনো একটি অভ্যাস পরিবর্তনের চেষ্টা কর। এক- একদিন এক-একটা অভ্যাস পরিবর্তন কর। অলসতা আছে? নিজের অলসতাগুলো নিজেকে ধরিয়ে দাও। সব কিছু পরের জন্য রেখে দিয়েছ? পরে কবে আসবে? কোন একটি লক্ষ্য নির্দিষ্ট করলে তা নিয়ে আকাশ কুসুম ভেবে লাভ নেই। অধিকন্তু এই নির্দিষ্ট লক্ষ্যটিতে পৌঁছাতে হলে ছোট ছোট কী কী অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা বা দৃষ্টি দিতে হবে। কতটুকু ঘাম ঝরাতে হবে সেখানে দৃষ্টি দিতে হবে। সব সময় বড় কিছু আশা করবে। কেননা তুমি পৃথিবীতে একজন অদ্বিতীয় মানুষ। তোমার মতো আর কেউ নেই। একটি মাত্র জীবন তোমার। তোমার অভ্যাসগুলোর সাথে যুদ্ধ কর। নিজেকে অনুপ্রাণিত কর, দেখ কতটুকু যেতে পার। যখন সফল হবে সত্যিই অবাক হয়ে যাবে।

ভয়ঙ্কর ৩৫ মিনিট

হাফেজ মু. আবু মুসা
কলেজ নম্বর : ৯৯৯৯
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-ক (দিবা)

সে দিন ছিল এল ক্লাসিকো। বার্সেলোনা ও রিয়ালমাদ্রিদের মহাউত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ, খেলা শুরু হবে রাত ১টা ৪৫ মিনিটে। এই খবর আমরা যেমন জানি আবার আমাদের শিক্ষকরা ও অর্থাৎ ঝালকাঠী এন এস কামিল মাদ্রাসার ১৪৫ জন স্যার ও হুজুর বিষয়টি খুব ভালোভাবে জানেন। কারণ, তাদের সকাল ৮টার ক্লাস-পূর্ব মিটিংয়ে সকল ব্যাপার আলোচনা হয়। ইদানীং সেখানে প্রধান আলোচনার বিষয় বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের আন্তর্জাতিক খেলা কোন কোন তারিখ এবং বার্সা ও রিয়ালসহ ম্যানইউ, ম্যানসিটির খেলা কোন কোন রাতে। কারণ ছাত্ররা এসব দলের খেলা দেখতে রাত ১২টা-১টার সময় ৪১ একরবিশিষ্ট বিশাল ক্যাম্পাসের চার্দিকের সীমানাপ্রাচীর টপকে খেলা দেখতে যায়। তাও আবার মাইল খানেক দূরের হিন্দুপাড়ায়। সেই হিন্দুপাড়ায় কিছু দিন আগে খেলা নিয়ে জুয়াজনিত ঘটনায় বিশাল মারামারি হয়েছে। সেখানকার হিন্দু নেতারা মাদ্রাসার প্রিন্সপাল হুজুরকে মোবাইল করে বিভিন্ন কথা শুনিয়েছেন মাদ্রাসা ছাত্র সম্পর্কে। পরবর্তীতে কোনো মাদ্রাসা ছাত্রকে পেলে বেঁধে রাখবে এমন কথাও নাকি বলেছেন। তাই শিক্ষকরা আমাদের নিয়ে ইদানীং বেশিই চিন্তিত। ক্লাসটিচাররা আতঙ্কে থাকেন তার ক্লাসের কোনো ছাত্র খেলা দেখতে গিয়েছে কিনা? যাই হোক, আমরা যেন Don't care. কোনো টিচার প্রিন্সপ্যালের ঝাড়ি খেলেন তা দেখতে যেন আমাদের বয়েই গেছে। আমরা আমাদের কাজ আগেই অনেকখানি গুছিয়ে রেখেছি। যারা ১৩ জোড়া চোখ ফাঁকি দিয়ে দারোয়ান দাদুদের ৮ জোড়া চোখ ফাঁকি দিয়ে খেলা দেখতে যাওয়ায় সাহসী তাদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে

বিকেলেই। যদিও ধরা পড়লেই বহিষ্কার (মাদ্রাসা টিসি)-এর কথা শুনে দলে লোক সংখ্যা কমে ১৩ জনে গিয়ে ঠেকেছে। এতে আমাদের সুবিধাই হয়েছে, কারণ যত মাথা তত কথা। যথারীতি এশার নামাজ শেষ করে রাত্রীকালীন ক্লাস শেষে আমাদের সঙ্গীরা মুড়ি পার্টির আয়োজন করেছে। একসাথে আমাদের ক্লাস টিচারের সাথে গল্প করতে করতে সবাই মুড়ি খেলাম, সবশেষে রাত্র ১০.৩০ মিনিটে তিনি হাজিরা নিয়ে বিভিন্ন বাণী শুনিয়ে বাসায় চলে গেলেন। এবার আমরা সবাই প্রস্তুত হলাম নোংরা পাঞ্জাবি পরে (দরকার পড়লে যেন ফেলে দিতে পারি), মুখে সৌদি রুমাল বেঁধে (যেন কারো মুখ না চেনা যায়) একজন একজন করে নিচে নেমে গেলাম। সবাইকে সিঁড়ির নিচে দাঁড় করিয়ে আমি একটা মোবাইলসহ সামনে গেলাম অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে। অবস্থা ভালো দেখে বের হয়ে গেলাম দেয়াল টপকে। মোবাইলে কল দিলাম। মোবাইল দলের কাছে রেখে আরেকজন চলে এলো, একে একে ১২ জন এলো। আরেকজন ক্যাম্পাসে থেকে গেল। শিক্ষকদের গতিবিধি লক্ষ্য করে, কোনো সমস্যা হলে মোবাইল করে জানিয়ে দিবে। যাই-যাই করে এক সময়ে পৌঁছে গেলাম কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। গন্তব্য বলতে দোকানে, সেই হিন্দুপাড়ায়, এ ছাড়া আমাদের কোনো জায়গা নেই নিরিবিলি খেলা দেখার। ভাইয়াকে ফোন করলাম, ২-৩ বার রিং হওয়ার পর ফোন তুলে বললেন, '১ টা ১৫ বাজে, এত দেরি করলি ক্যান। তাড়াতাড়ি আয়। কোনো সমস্যা নাই সব পাড়া ঘুমাইছে' সাদ্দাম ভাইয়ের অভয়বাণী পেয়ে দ্রুত কিন্তু শব্দহীনভাবে চলা শুরু করলাম। ৭-৮ মিনিট পরই ভাইয়ের দোকানের সামনে। দোকানের ছোট দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে নিরাপদ বোধ করলাম। সবাই খুব খুশি। যেন ঝড়ের মধ্যে দীর্ঘ সমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে তীর দেখতে পেয়েছি।

খেলা শুরু হলো আক্রমণ প্রতি আক্রমণ, ফাউল, অফলাইন, হলুদ কার্ড, চরম উত্তেজনায় যখন প্রথমার্ধ শেষ, খেলা তখন ২-১ এগিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু তেমন একটা চিন্তা নেই আমাদের। কারণ, প্রথম ৪৯ মিনিট MSN-এর আক্রমণ সামলাতে দেখে মনে হয়েছে রিয়ালের ডিফেন্ডাররা পুরাই কাহিল। দ্বিতীয়ার্ধে খেলোয়াড় না পাল্টালে ঐ ডিফেন্ডাররা অগণিত গোল খেতে দ্বিধাবোধ করবে না। এ কথা আলোচনা করছি আর সাদ্দাম ভাইয়ের দোকানের চানাচুর সাবাড় করছি সবাই। আবার খেলা শুরু হলো। ৫ মিনিট যেতে না যেতেই সব কিছু ওলট-পালট করে রোনালদোর গোল। পুরা মাথা গরম হয়ে গেল। ওদিকে মোবাইলে ঘরঘর.... শব্দ করছে। নিশ্চয়ই কোনো খবর দিতে চাইছে মাদ্রাসা থেকে। কিন্তু তখন আমরা অন্য জগতে। ওরা বলছে মোবাইল ধরবি না। তৃতীয় গোল হজমের পর বার্সেলোনা গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। বার্সা বললে ভুল হবে, বলতে হবে MSN, মেসি, নেইমার ২ উইং থেকে বল বাড়ায় আর সুয়ারেজ বার কাঁপিয়ে শট। পুরাই জমছে খেলা। এরই মধ্যে দোকানের বাইরে থেকে কে যেন বলে উঠল, সাদ্দাম টিভি বন্ধ কর পুলিশ আসছে। সাদ্দাম ভাই সাথে সাথে টিভি বন্ধ করলেন। আমরা বসে আছি, জিপের শব্দ শুনতে পেলাম, আস্তে আস্তে যেমনি করে শব্দটা বড় হলো ঠিক তেমনি করেই কমে গেল। আমি ফোনটা ধরলাম প্রায় ১৬টা কল দিয়েছে। কল ব্যাক করার সাথে সাথেই রাকিব বলল তাড়াতাড়ি মাদ্রাসায় আয়। অনেক ছাত্র ক্যাম্পাসের বাইরে হুজুররা টের পাইছেন, রাকিবের কথার ধরন আর পুলিশের গাড়ি, কেমন জানি মনে হইল ব্যাপারটা। মনে মনে কইলাম 'শালার খেলা, ঝামেলা হইব ম্যালা।' সবাইরে বললাম বাইর হ তাড়াতাড়ি। দিলাম দৌড় এক দৌড়ে মেইন রোডে। হাঁটতে হাঁটতে ব্রিজের উপর উঠলাম, বড় ব্রিজ। অনেক উঁচু। ব্রিজের সাথেই একটি চিকন রাস্তা। মাদ্রাসায় যাওয়ার একমাত্র রাস্তা। ব্রিজের উপর দাঁড়াইয়া গল্প করছি খেলা সম্পর্কে। এমন সময় ব্রিজের নিচ থেকে এক লোক বললেন, তোরা কি করস ব্রিজের উপর? দেশে ১৪৪ ধারা, আর তোমরা রাইতে ঘুরতে বাইর হইছ? পুলিশে পাইলে বুঝবা ঠ্যালা! ঠিক তখনই মনে হইল আজ তো দুজন যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসির তারিখ। সারা দেশে ১৪৪ ধারা জারি আছে। এই অবস্থায় যেখানে রাত ৮টার পর বাইরে থাকতে সরকার নিষেধ করছে সেখানে আমরা রাত ৩টার সময় রাস্তায়। তাও আবার পাঞ্জাবি, টুপি ও মুখে রুমাল পেঁচানো। যাকে বলে জঙ্গি স্টাইল। মনে হওয়া মাত্রই পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। এরই মধ্যে ব্রিজের ঢাল থেকে পুলিশের গাড়ি আসা শুরু করল এবং যে রাস্তায় মাদ্রাসায় যাব ঐ দিক থেকে একটি গাড়ির সাইরেন বাজছে। তার মানে তারা আমাদের পাঞ্জাবি, রুমালওয়ালা ১২ জনের দলকে দেখে ফেলেছে। সবাই ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। মস্তিষ্ক তার সমস্ত কোষসহ যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। পুলিশের গাড়ি আরো কাছে এসেছে। প্রায় ১৫০ হাতের মধ্যে। এমন সময় নিচ থেকে আবার চিৎকার, 'গরুর লাহান খাড়াইয়া রইছস ক্যান- নিচে নাইমা আয়।' এবার যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল শরীরে। ব্রিজ থেকে নিচে নামার সিঁড়িগুলো কীভাবে ডিঙিয়েছি জানি না, শুধু জানি ১১টা গুনে ১১ নাম্বারটাকে ধাক্কা মেরে তিন লাফে সব সিঁড়ি ডিঙিয়ে মাটির স্পর্শ পেলাম। এরপর শুধু একটা কথাই বললাম। 'কেউ ধরা খাবি না।' ব্রিজের নিচে সিঁড়ি দিয়ে মোট আটজন পুলিশ সদস্যকে নামতে দেখলাম। দুজনের হাতে দুটো টর্চ লাইট। টর্চ লাইট না যেন আস্ত একটা চাঁদ। চারদিক রুপালি আলোয় চিকচিক করছে যেন। দোয়ায়ে ইউনুসসহ হাফেজি জীবনে যত দোয়া-দুরুদ পড়েছি, মুখস্থ করেছি, সব পড়ার চেষ্টা করলাম। কিছু কিছু মনে পড়ে আবার কিছু কিছু মনেই পড়ছে না। এর মধ্যে আমাদের দুজনকে দেখলাম পা টিপে টিপে উপরে উঠছে। কিছু বললাম না। পুলিশ প্রায় ৩৫ মিনিট তন্ন তন্ন করে সব খুঁজল কাউকে পেল না। পেল কয়েকটি জুতা। ৩৫টা মিনিটই যেন ছিলাম ফুটন্ত তেলের উপর।

জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ৩৫ মিনিট কাটিয়েছি ঐ রাতে। জানি না ধরা পড়লে কী হতো। হয়তো জঙ্গি বলে চালিয়ে দিত, অথবা যশোর শিশু কিশোর কারাগারে পাঠাত ১০ বছরের জন্য। নাহ, কিছুই হয়নি এসব। তবে এক বন্ধুর কারণে ধরা খেয়েছিলাম হুজুরদের কাছে। অনেক বিচার, বেত্রাঘাত সহ্য করেছি, কিন্তু তা ঐ ৩৫ মিনিটের কাছে কিছুই না। তবে একটা কথা বলি ম্যাচটা কিন্তু বার্সাই জিতছে ৪-৩ গোলে। এখনো শিউরে উঠি মনে পড়লে সেই রাতের কথা।

হাউজের দিন

মাহ্দী মুহম্মদ ইরাম
কলেজ নম্বর : ৯১১৩
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-গ (দিবা)

অনেক আশার DRMC-তে অবশেষে ভর্তি হলাম। আরেকটা ইচ্ছা ছিল হাউসে থাকব। একমুঠো স্বপ্ন ও কিছু বেঁচে থাকার সরঞ্জাম নিয়ে হাউসে প্রবেশ করলাম একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই আশপাশের বাতাসে একটি বিষয়েরই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল যে কে কীভাবে হাউস থেকে বেরিয়ে যাবে। বাইরে গিয়ে কীভাবে থাকবে। বিষয়টা অনেক খারাপ লাগছিল। হাউসে থাকার জন্য এক সময় তারা মেঝেতে থাকতেও রাজি ছিল আর এখন এই অবস্থা। এত তাড়াতাড়ি এমন একটি চিন্তা-ভাবনা এলেই মেনে নেয়ার নয়। আসলে আমরা খারাপ দিকটি ভাবতে বেশি সময় ব্যয় করে থাকি আর তা নিয়ে বেশি মাতামাতিও করে থাকি। যার ফলে আমরা ভালো দিকটি থেকে দূরে সরে যাই। ভালো বিষয়গুলোকে বুঝতে পারি না আমাদের মনে খারাপ অনুভূতিগুলোই বাসা বেঁধে নেয় যার ফলে আর জায়গা থাকে না ভালো কিছুর।

জীবনে ভালো-মন্দ উভয়ই আছে তা আমরা সবাই জানি। ভালোকে খোঁজার চেষ্টা না করে মন্দ খুঁজে বেড়ালে খারাপ লাগবে এটিই স্বাভাবিক। একেক জনের চিন্তা-ভাবনা একেক রকম এ জন্যও এমন হতে পারে, যাই হোক আমি এখানে থাকতে চাই কিছু জিনিস আরো ভালো হলে হয়তো থাকার ইচ্ছা আরো বেশি হতো। কথায় আছে না কোনো কিছুই একদম বিশুদ্ধ না। কিন্তু সব দিক দিয়ে যথেষ্ট ভালো DRMC হাউসের জীবন। সকালে উঠে নামাজের পর খাওয়া-দাওয়া, তার আগে একটু পিটি নিশ্চয় কোনো খারাপ অভ্যাস নয়। অতঃপর পড়াশোনা করার সময় মাঝে চায়ের বিরতি তারপর গোসল করে খাওয়া-দাওয়া এবং কলেজে যাওয়া। কলেজ থেকে ফিরে একটু হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম, তারপর সবাই একসাথে সাদা পাঞ্জাবি ও সাদা টুপি পরে নামাজে যাওয়া। একসাথে নামাজ পড়ার দৃশ্যটা সত্যিকার অর্থে মনোমুগ্ধকর। নামাজ শেষে রাতের খাবার পর নাইট ক্লাসে গিয়ে পড়াশোনা করা, হাউসে ফিরে আবার ২-৩ ঘণ্টা পড়ার পর ঘুম। জীবন এতটাও খারাপ না। আমাদের জীবনের মর্মটা বুঝিয়ে তুলতে সাহায্য করছে প্রতিনিয়ত। আগে নিজের কাপড়গুলো ইচ্ছামতো নোংরা করতাম, নিজের ঘর অগোছালোভাবে ফেলে রাখতাম। সময় মতো খেতাম না, এভাবেই দিন চলত। আর এখন কাপড় নোংরা করতেও যেন কষ্ট হয়। কাপড় বেশি নোংরা করলে কাপড় কাচতে কষ্ট হবে। নিজের রুম অগোছালো রাখলে গোছানোর আর কেউ নেই। সময়মতো খাবার না খেলে আর খাবার পাব না। মাছ খাই না, মাংস খাব এই আবদারও করতে পারব না কারো কাছে। টয়লেট নোংরা করে রাখব তা হবে না, নিজেকেই যেতে হবে।

খাবারে যাওয়ার সময় সাদা পোশাক পরে যাওয়াটাও একটি নিয়ম। খাবারের সময় অস্থির হয়ে পড়লে খাবার গায়ে পড়বে তখন সাদা কাপড়ে দাগ পড়ে যাবে। এর মধ্যে সাবধানতার একটু শিক্ষা রয়েছে। শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, শিক্ষা সব এর মাঝে আছে। কিন্তু তারপরও অনেকে এই জীবনকে খারাপ বলে দাবি করে তখন অনেক কষ্ট লাগে, যদিও বেশি সময় হয়নি এখানে আমার। আসলে DRMC-র হাউসে কোনো সমস্যা নেই তারা এসব বিষয়-বস্তুকে মানিয়ে নিতে পারে না এ জন্য নিজের দোষগুলো হাউসের জীবনের উপর দিয়ে দেয়। হ্যাঁ কষ্ট অবশ্যই আছে। কষ্ট না করলে কি জীবনে কিছু করা যায়? অবশ্যই জীবনে কষ্ট-আনন্দ সব কিছুই আছে। তার মধ্যেই হাসিমাখা মুখ নিয়ে জীবনকে উপভোগ করতে হবে। জীবনকে সাজিয়ে তুলতে হবে আপন করে স্বপ্নগুলোকে সার্থক করতে হবে। জানি কথা বলা অনেক সহজ এবং বাস্তবায়ন করা অনেক কঠিন। কিন্তু প্রবল ইচ্ছা এবং দৃঢ় মনোবল ও প্রতিজ্ঞা যদি কারো মাঝে থাকে তাহলে অবশ্যই তার ভালো হবে, হাউসের কেউ হোক বা বাইরের। কিন্তু হাউসের এত নিয়মের মাঝেও আমি কেমন জানি হাউসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। আশা করি আমি একজন ভালো ছাত্রের সাথে সাথে একজন ভালো মানুষ হয়ে এই জায়গা থেকে বের হতে পারব। আবারো বলতে চাই হাউসের লাইফ খারাপ নয়, উপভোগ করলে অনেক মজার।

স্বপ্ন পূরণ

এনামুল হক
কলেজ নম্বর : ৯২৮৮
শ্রেণি ও শাখা : দ্বাদশ-গ (দিবা)

লক্ষ্য আমাদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে গঠিত হয়। তবে লাখ টাকার চাকরির লক্ষ্য কমবেশি প্রায় সবার। লাখ টাকা একটা মানদণ্ড। এর চেয়ে বেশি আয়ের চাকরি পেলে ভালো, তবে এটা না পেলে হবে না।

এখন, আমরা একটা সাধারণ দৃশ্যকল্প ঠিক করি। দেড় লাখ টাকার বেতনে একজন মানুষ কী কী পেতে পারেন?

প্রথমত : এই পরিমাণ অর্থ মূল্যের চাকরি পেতে হলে খুব ভালোমানের পড়াশোনা করে আসতে হবে। তা সেটা বাংলাদেশে হোক বা বিদেশে। ২৭-২৮ বছরের আগে তা সম্ভব হয় না। এরপর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য কিছু সময় দিতে হয়। কিন্তু আমরা দৃশ্যকল্পকে আদর্শ ধরতে চাই এবং তাই তাতে ধরে নিচ্ছি অভিজ্ঞতা ছাড়াই এ রকম বেতনের একটি চাকরি পাওয়া গেল। চাকরিজীবীর পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচ। সেই পরিবারের আয় খুব বেশি নয়। অর্থাৎ নতুন এই চাকরিজীবী পরিবারের হাল ধরবেন।

পরিবারের মান উন্নয়নের জন্য কী করা যেতে পারে?

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করবেন। বর্তমানে হয়তো কোনো নিম্নমানের এলাকায় ঘিঞ্জি বাসায় চাপাচাপি করে থাকতে হচ্ছে পাঁচ সদস্যের এই পরিবারকে। সুতরাং, উপযুক্ত পদক্ষেপ হবে কোনো সম্ভ্রান্ত এলাকায় বসতি স্থানান্তর। ভালো বাড়ি, উন্নত খাবার-দাবার, পোশাক-আশাক। দেড় লাখ টাকার চাকুরেও প্রথমেই বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনতে পারবেন না। তাই তাকে বাড়ি ভাড়া করতে হবে।

এরপর অবশ্যই ভবিষ্যতের কথা চলে আসে। এখানে আমরা সাধারণ মানুষ দুটো বিষয়কে প্রাধান্য দেই। নিজের বাড়ি বা ফ্ল্যাট এবং নিজস্ব গাড়ি। বিদেশ স্থানান্তরের কথা আনলাম না। আদর্শ দৃশ্যকল্পের চাকরিজীবীকে আদর্শ দেশপ্রেমিকও ধরা যায়।

তো, একটা ভালো ফ্ল্যাট কোনো ভালো এলাকায় বর্তমানে ৩৫-৪০ লাখ টাকার কমে পাওয়া কঠিন। গাড়িও ধরলাম ৩০ লাখ। মোট মিলিয়ে ধরি ৬৫ লাখ টাকার প্রয়োজন, নিজস্ব স্বপ্ন পূরণ করতে।

দেড় লাখ টাকার এই চাকরিজীবী পরিবারকে ভালো করে খাইয়ে পরিয়ে মাসে ৩০ হাজার টাকা জমাতে শুরু করলেন, ধরে নিই, তিনি সুদ নেবেন না, কারণ তিনি আদর্শ ধার্মিক। বিভিন্ন ভালো জায়গায় পরিবারকে ঘুরতেও নিয়ে গেলেন না, কারণ তার প্রতি মাসে ৩০ হাজার টাকা প্রয়োজন। তো কত বছর পর তিনি ৬৫ লাখ টাকার লক্ষ্যে পৌঁছাবেন?

কমপক্ষে ১৮ বছর। তখন তার বয়স ৪৫ কি ৪৬ বছর। ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত অফিস করে চারপাশে আদর্শ পরিবেশে ঘেরা দেড় লাখ টাকার এক চাকরিজীবীর স্বপ্ন পূরণ করতে করতে ৪৫ বছরের মতো খরচ হয়ে যায়। আর যদি আমরা বাস্তবের সাথে পুরো ঘটনা মেলাই? আরো ৫-৭ বছর দেরি হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। হয়তো তত দিনে সেই চাকরিজীবীকে ছেঁকে ধরবে ডায়াবেটিস, হয়তো তার দু-একটা ছোটো-খাটো হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। বাকি জীবনটা স্বপ্ন পূরণের আনন্দ নিয়ে কাটাতে পারবেন তিনি ঠিকই, কিন্তু তার অর্জন উপভোগ করার মতো অনুভূতি অবশিষ্ট থাকবে কিনা– তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

আর এরপর এই জীবনের ভার টানতে টানতে ক্লান্ত হয়ে একদিন হাল ছেড়ে দেবেন তিনি। তাকে অনুসরণ করবে হয়তো তার উত্তরাধিকারীরা। তাদের স্বপ্ন আরো বড় হবে, কিন্তু স্বপ্ন পূরণের আগে তার আনন্দ পাওয়া হবে না। তো স্বপ্ন পূরণের এমন সমাধির জন্যই কি আমরা সারা জীবন এত কষ্ট করি???

DRMC ঘিরে নতুন পথচলা

তাপস কুমার রায়
কলেজ নম্বর : ৯৭৩৮
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-ঙ (দিবা)

অচেনা জায়গা, অচেনা পরিবেশ, অচেনা বন্ধুমহল– সব কিছুই অচেনা তবুও DRMC নামটার উপর আস্থা এবং বিশ্বাস রেখে কলেজ জীবনের পথচলা শুরু হলো। গল্পটি যখন লিখছি তার কিছু ঘণ্টা আগেই এইচএসসি-২০১৭ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে পুরো দেশের অবস্থা বিবেচনায় DRMC-এর ফলাফল অনেক ভালো। DRMC-তে আমার এক মাসেরও কম সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, এখানকার শিক্ষকরা অনেক ফ্রেন্ডলি এবং সবাই অনেক Caring। ছাত্রদের সমস্যাকে তারা নিজেদের সমস্যা বিবেচনা করে তার সমাধান করে। এখানকার বিশাল ক্যাম্পাস আমাদের বিশাল স্বপ্ন দেখতে উৎসাহিত করে। আমার আগামীর পথচলা হবে DRMC-কে ঘিরে। সবাই যেন 'উৎকর্ষ সাধনে অদম্য' হই। এটিই হলো DRMC-এর লক্ষ্য। তাই আমরা অর্থাৎ গর্বিত 'Remian'-রা সবাই আগামী দিনে উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হবে এটিই আমার কামনা।

অলিখিত অধ্যায়

সালেহ আব্দুল্লাহ
কলেজ নম্বর : ১৪৭৯৮
শ্রেণি ও শাখা : দ্বাদশ-ঙ (প্রভাতি)

সবাই চুপচাপ, আসলে চুপচাপ নয় একজনের বিশেষ নজর ফাঁকি দিয়ে সবাই গুজগুজ করে গল্প করে যাচ্ছে। কিন্তু সেই বিশেষ একজনের নজর এড়ানো গেল না ধরা পড়ে গেল আমাদের একজন বন্ধু। বিশেষ নজরদারি বললেন–

- এই যে বাবা তুমি, হ্যাঁ তুমি, এইযে যে ডানপাশে তাকাচ্ছ তুমিই; যার মাথায় টুপি নেই দাঁড়াও তো বাবা।

আমাদের বন্ধুটি উঠে দাঁড়াল। চোখেমুখে অপরাধী ভাব এবং খানিকটা বিব্রতও। আবার তার বিব্রতকর পরিস্থিতি নিয়ে ঠাট্টা করার জন্য আমরা তো পাশেই আছি। তবে আমরা সবাই মুহূর্তের মধ্যে তার কাছ থেকে যে যতখানি পারি নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছি এমন ভাব যে আমাদের পাশে যে বসেছিল তাকে আমরা চিনিই না।

- বাবা মসজিদ কি দুনিয়াবি আলাপের জায়গা? আচ্ছা বাবা বল তো তুমি কী নিয়ে গল্প করছিলে আমরাও শুনি....

আমরা সবাই পাশ থেকে আস্তে করে বলি : বল, কী নিয়ে গল্প করতেছিলি....

বলে যে যার হাসি নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত হয়ে যাই।

মসজিদের মাঝখানে মোটা পিলারটার পাশে আমরা সবাই বসতাম। সকালের মর্নিং পিটি, ক্লাস ঘুম, গেমসের পরে মাগরিবের নামাজই একমাত্র সময়, যেখানে আমরা দুই হাউসের বন্ধুরা একত্র হতাম এবং বারবার হুজুরের চোখ ফাঁকি দিয়ে সারা দিনের যে কথা জমত হড়বড় করে বন্ধুদের বলে যেতাম, যেন কথা বলার প্রতিযোগিতা কে কার আগে কথা বলতে পারে। সংখ্যায় আমরা নেহাতই কম ছিলাম না, ৩০ জনের কাছাকাছি, তাই কোনো একজনের কথা শুনে ৩০ জন যখন হো হো করে হাসত সাধারণতই ব্যাপারটি হুজুরের জন্য চরম বিরক্তিকর ঠেকত। অন্য সবার মতো আমারও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতি রয়েছে এই ক্যাম্পাসজুড়ে যা বলতে গেলে শেষ হবে না। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমাকে বলতে হবে অন্য কথা। নাহ..... আজ আমি বলব না আমি একজন রেমিয়ান, আমি বলব একজন Old remain-এর কথা। বর্তমানে Old remain-দের কথা।

বর্তমানে আমি দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। হাউসবয়, কলেজে আর মাত্র কয়েক মাসই আছি। তারপরেই এই ক্যাম্পাস, জীবনের সবচেয়ে রঙিন ১০টি বছর সবই স্মৃতি। ঐ যে বললাম মসজিদের মাঝখানের দিকে মোটা পিলারটার পাশে যেখানে আমরা সবাই বসতাম, আমি সেইখানেই বসে আছি। চারপাশে দেখছি নতুন সব মুখ, নতুন মুখের ভিড়ে আমি খুঁজছি পুরাতন মুখ, যারা ফার্স্ট ইয়ারে নতুন ভর্তি হয়েছে। Old Student একটা, দুইটা, তিনটা আর খুঁজে পাই না নতুনদের মাঝেই আবার দৃষ্টি হারিয়ে যায়। কলেজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অনেক পরিবর্তনই লক্ষ করার মতো, কিন্তু নিজের অজান্তেই একটি বড় পরিবর্তন লক্ষ করলাম আমার আশপাশে। আজ আমি আমার সেই নির্দিষ্ট জায়গায় বসে আছি, কিন্তু আমার চারপাশে নেই আমার সেই বন্ধুরা। সময় বদলের সাথে সাথে একে একে সবাই হাউসের ঠিকানা পরিবর্তন করেছে। কেউ-বা পড়াশুনায় অধিক মনোযোগী হওয়ার জন্য ফিরে গেছে তাদের নিজ বাসায়।

এই বিশাল সবুজ মাঠ আমাদের কলেজের সৌন্দর্য-শৃঙ্খলা আমাদের গর্ব আর এই বিশাল কলেজের সৌন্দর্য, গর্ব এবং ঐতিহ্য বহন করে আমাদের হাউস। হাউস ছোট একটি শব্দ কিন্তু এই চার দেয়ালের মাঝে যে ছয়টি দালান নীরবে দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো ঘিরে আমি এবং আমার বড় হাজারো রেমিয়ান ভাই নিঃসন্দেহে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কাটিয়েছে।

আমরা যখন ক্লাস থ্রি কিংবা ফোরে পড়তাম সারা দিন অধীর আগ্রহে একটি সময়ের জন্যই অপেক্ষা করতাম 'গেমস টাইম'। যদি কখনো 'গেমস টাইম'-এর আগে বৃষ্টির জন্য গেমস বন্ধ হয়ে যেত মনের দুঃখে আকাশের দিকে তাকাতাম আর ভাবতাম আল্লাহ এত নিষ্ঠুর কেন? আর 'গেমস টাইম' তো আরেক ইতিহাস প্রতিদিনই সিনিয়রদের সাথে মাঠ নিয়ে চলত নানান ধরনের দেনদরবার। শেষে সারা কলেজ ঘুরে যে মাঠ ফাঁকা পেতাম সেখানেই নেমে যেতাম খেলতে। বর্তমানে গেমস টাইমে সাদা গেঞ্জি আর নেভি ব্লু প্যান্ট পরিহিত বালকদের থেকে সময়ে-অসময়ে মাঠের এক কোণায় রঙিন প্যান্ডেল মাঠের চারপাশে নানা ধরনের পোস্টার (স্পনসার) এবং রঙ-বেরঙের জার্সি পরিহিত মানুষের লম্ফঝম্ফ দেখা যায়। আমরাও নিয়মিত মাঠের চারপাশে দাঁড়িয়ে বিপুল আনন্দের সাথে এই লম্ফঝম্ফ (খেলাধুলা) উপভোগ করি।

DRMC যদি একটি দেহ হয় হাউসগুলো হলো তার প্রাণ। আমাদের অতি প্রিয় একজন ম্যাডামের লেখায় পড়েছি যে, হাউসে হাউসে চলত তুমুল প্রতিযোগিতা। যে সময়ে প্রতিযোগিতার মধ্যে হাউসের উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেঁচে থাকে যে বিড়াল-কুকুর তাদের মালিকানা নিয়েও চলত কাড়াকাড়ি।

শেষে বলব, DRMC-এর সাথে মিশে আছে আমাদের সবার আশা-আকাঙ্ক্ষা। আমাদের সবার স্বপ্ন যেখানে বিকেল বেলা সারা মাঠজুড়ে থাকবে সাদা গেঞ্জি এবং নেভি ব্লু প্যান্ট পরা ছাত্রদের দৌড়াদৌড়ি এবং অবশ্যই যেখানে একজন ছাত্র কাটাবে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। যে সময় এবং স্মৃতি তাকে বারবার টেনে আনবে এই ক্যাম্পাসে।

জানা-অজানা, কৌতুক-ধাঁধা

মো. নাসরাত আলাভি
কলেজ নম্বর : ১৫২০২২০
শ্রেণি ও শাখা : পঞ্চম-গ (দিবা)

১. রানি মৌমাছি দিনে প্রায় ১৫০০টি ডিম পাড়ে।
২. পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো গাছটি ব্রিসলকোন পাইন নামে পরিচিত যার বয়স ৪৬০০ বছর। এটি ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত।
৩. মৌমাছি প্রতি মিনিটে প্রায় ১২০০০ বার ডানা কাঁপটায়।
৪. কবুতরের হাড়ের ওজন তার পালকের ওজনের চেয়ে কম।
৫. মানুষের শরীরে যে পরিমাণ ফসফরাস আছে তা দিয়ে প্রায় ২২০০টি দিয়াশলাই বানানো যায়।
৬. মধু একমাত্র খাদ্য যা কখনো পচে না।
৭. মাছির গড় আয়ু ১৭ দিন।
৮. Facebook.com কে Fb.com বানাতে মার্ক জুকারবার্গের ৮৭ মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। তাই মার্ক জ্যাকারবার্গকে ফেসবুকে কখনো ব্লক করা যায় না।
৯. মানুষের চোখের পাতা পড়তে ১ সেকেন্ডের ১৬ ভাগের ১ ভাগ সময় লাগে।
১০. তেলাপোকার হৃৎপিণ্ডের সংখ্যা ১৩টি।
১১. ইউরোপে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৮০ লাখ।
১২. জিরাফ নিজের কান পরিষ্কার করে তার ২১ ইঞ্চি জিহ্বা দিয়ে।
১৩. একটি প্রজাপতির চোখের সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার।
১৪. আফ্রিকার কৃষ্ণ মৃগ জীবনে পানি পান করে না।
১৫. একটি কাঁকের প্রতিদিন গড়ে ৩০০ গ্রাম খাদ্য দরকার হয়।
১৬. একজন মানুষ গড়ে দিনে ৪ হাজার ৮৫০টি শব্দ উচ্চারণ করতে পারে।
১৭. পিঁপড়ার মগজ তার দেহের চেয়ে বড়।

সামি সাদিক
কলেজ নম্বর : ১৫৩৮৩
শ্রেণি ও শাখা : তৃতীয়-খ (প্রভাতি)

চীনের প্রাচীর কেন তৈরি হয়েছিল

পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি হলো চীনের প্রাচীর। এ প্রাচীরের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৪০০ কিলোমিটার উচ্চতা ৪.৫৭ থেকে ৯.২ মিটার ১৫ থেকে ৩০ ফুট, চওড়া ৯.৭ মিটার বা ৩২ ফুট। ২৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চীন খণ্ড খণ্ড রাজ্য ও প্রদেশে বিভক্ত ছিল। শি ইয়াং ছি এসব রাজ্যকে একত্র করে নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দেন। চীনের উত্তর দিকে গোবী মরুভূমির পূর্বে দুর্ধর্ষ মোঙ্গলদের বাস ছিল। তারা বিভিন্ন সময়ে চীনের বিভিন্ন প্রদেশে অতর্কিত হামলা চালিয়ে লুটতরাজ করত। তাই সম্রাট শি ইয়াং ছি মাঞ্চুরিয়া ও মোঙ্গলিয়ার যাযাবর দস্যুদের হাত থেকে চীনকে রক্ষা করার জন্য এ মহাপ্রাচীরটি তৈরি করেন।

মো. সাকিব ইবনে হাসান
কলেজ নম্বর : ১৫৩৩৩
শ্রেণি ও শাখা : তৃতীয়-গ (প্রভাতি)

রিকশাওয়ালা

১. বল্টু এক রিকশাওয়ালাকে ডেকে বলল,
বল্টু : এই রিকশাওয়ালা, যাবেন?
রিকশাওয়ালা : যাব।
বল্টু : তো যান!

জিরাফের মামলা

২. জঙ্গলে মিটিং বসেছে।
বাঘ : এবার খুব শীত পড়েছে। আমাদের সবাই কষ্ট পাচ্ছে। বিশেষ করে জিরাফরা বেশি কষ্টে আছে।
বানর : কেন?
বাঘ : অত লম্বা মাফলার পাওয়া যাচ্ছে না।

কোল্ড কফি

৩. স্ত্রীকে নিয়ে শফিক সাহেব গেছেন একটি কফির দোকানে।
শফিক : তাড়াতাড়ি শেষ করো, কফি ঠান্ডা হচ্ছে।
স্ত্রী : কেন? সমস্যা কী?
শফিক : আরে বুদ্ধু, মূল্য তালিকা দেখো।
'হট কফি' ১৫ টাকা 'কোল্ড কফি' ৫০ টাকা।

আরাফাত রহমান
কলেজ নম্বর : ১৫৩৫৫
শ্রেণি ও শাখা : তৃতীয়-গ (প্রভাতি)

ইংরেজ ভদ্রলোক : (পিঠা বিক্রেতাকে) হোয়াট ইজ দিজ?
পিঠা বিক্রেতা : ইট ইজ চিতই পিঠা।
ইংরেজ ভদ্রলোক : হোয়াট ইজ চিতই পিঠা?
পিঠা বিক্রেতা : ওয়ান সাইড ফুটা ফুটা আন্ডার সাইড mota অ্যান্ড is কল্ড চিতই পিঠা।

এক লোক কলাবাগান দাঁড়িয়ে এক রিকশাওয়ালাকে বলছে,
লোক : কলাবাগান যাব, কত নিবেন?
রিকশাওয়ালা : আসেন ২০ টাকা।
লোক : আচ্ছা
রিকশাওয়ালা : এসে গেছি। নেমে পড়েন।
লোক : এত জলদি! এই নাও ১০ টাকা বাড়িয়ে দিলাম।

কথোপকথন
১ম ব্যক্তি : কাগজ কেন বানানো হয়েছে?
২য় ব্যক্তি : প্লেন বানানোর জন্য।
১ম ব্যক্তি : মোবাইল কেন বানানো হয়েছে?
২য় ব্যক্তি : গেম খেলার জন্য।
১ম ব্যক্তি : ক্যালেন্ডার কেন বানানো হয়েছে?
২য় ব্যক্তি : বইয়ের ময়লা লাগানোর জন্য।
১ম ব্যক্তি : পড়ার টেবিল কেন বানানো হয়েছে?
২য় ব্যক্তি : টেবিলে ঘুমানোর জন্য।
১ম ব্যক্তি : আপনাকে কেন বানানো হয়েছে?
২য় ব্যক্তি : ফেল করার জন্য!!

তাইহান আনান
কলেজ নম্বর : ১৪৪৯০
শ্রেণি ও শাখা : চতুর্থ-গ (প্রভাতি)

ধাঁধা
* কম দিলে যায় না খাওয়া, বেশি দিলে বিষ
মা বলেছে, বুঝে শুনে
তার পরেতে দিস।
উত্তর : লবণ

* সাগরে জন্ম নিয়ে
আকাশে করে বাস
মায়ের কোলে ফিরে যেতে
জীবন হয় লাশ।
উত্তর : মেঘ

আকিব জামান
কলেজ নম্বর : ১৪৪৭৭
শ্রেণি ও শাখা : চতুর্থ-ক (প্রভাতি)

ধাঁধা
১. ডাব না খেলে কি হয়?
উত্তর : নারকেল।
২. তিন অক্ষরে নাম যার জলে বাস করে, মাঝের অক্ষর কেটে দিলে আকাশেতে চড়ে, কী?
উত্তর : চিতল-চিল।
৩. তিন অক্ষরে নাম যার ফুলের মালা হয়, মাঝের অক্ষর কেটে দিলে খেলার সামগ্রী হয়, কী?
উত্তর: বকুল-বল।
৪. তিন অক্ষরে নাম যার সবার ঘরে রয়, শেষের অক্ষর কেটে দিলে বিষাক্ত পোকা হয়, কী?
উত্তর: বিছানা-বিছা পোকা।

রম্য বাক্য সংকোচন
রাইয়ান আহমেদ
কলেজ নম্বর : ১৫১০৪৪৮
শ্রেণি ও শাখা : পঞ্চম-খ (প্রভাতি)

১. যা সহজেই ভাঙে- বিশ্বাস
২. জীবিত থেকেও মৃত- ঘরজামাই
৩. বিনা পুঁজিতে যে ব্যবসা- ভিক্ষা
৪. যা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে- দ্রব্যমূল্য
৫. যা দমন করা যায় না- ঘুষ
৬. যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে- ইভটিজিং
৭. যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে- মনুষ্যত্ব
৮. যিনি বক্তৃতা দানে পটু- চাপাবাজ
৯. পূর্বে ছিল এখন নাই- জমিদারি
১০. আপনাকে যে পণ্ডিত মনে করে- বাঙালি

মো. রাশেদুল ইসলাম ইয়ন
কলেজ নম্বর : ১৫৩০৩৬৯
শ্রেণি ও শাখা : পঞ্চম-ক (প্রভাতি)

শামসুল হক শাফিম
কলেজ নম্বর : ১৫৫৩৪
শ্রেণি ও শাখা : নবম- ঘ (প্রভাতি)

জেলে থেকে উপকার

* জেলে আটকে থাকা সন্তানকে চিঠি লিখল মা-

বাবা, তুই জেলে যাওয়ার পর আমার জীবন অনেক কঠিন হয়ে গেছে। জমি চাষ, চারা রোপণ করার জন্য কেউ নেই।

ছেলে ফিরতি চিঠিতে লিখল-

মা, তুমি জমি খুঁড়তে যেয়ো না। তাহলে জমিতে লুকিয়ে রাখা চুরির গহনা পুলিশ পেয়ে যাবে।

মা কয়েক দিন পর আবার চিঠি লিখল–

বাবা, তোর শেষ চিঠির পর পুলিশ এসে সব জমি কোদাল দিয়ে খুঁড়ে রেখে গেছে। কিছু পায়নি। গজ গজ করতে করতে চলে গেছে।

ছেলের জবাব–

মা, জেলে বসে আর এর চেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারলাম না। তুমি কষ্ট করে জমিতে আলুর বীজ পুঁতে দিয়ো।

টিভিতে ধুলা

এক বাসায় এক বুয়া খালি টিভি দেখে, কোনো কাজ করে না। সবাই তার ওপর বিরক্ত। তো একদিন বাড়ির কর্তার কাছে গিয়ে বলল, খালু, আইজ টিভিতে কী আছে?

কর্তা গম্ভীরভাবে বললেন, টিভিতে প্রচুর ধুলা আছে, ওগুলো পরিষ্কার করো।

মাছওয়ালা

একজন ইংরেজ সাহেব ও মাছওয়ালার মধ্যে কথোপকথন

মাছওয়ালা : এই, ইলিশ মাছ-ইলিশ মাছ, কিনবেন কেউ ইলিশ মাছ?

সাহেব : I See.

মাছওয়ালা : স্যার, আইছেন যখন বসেন।

সাহেব : How much.

মাছওয়ালা : স্যার কী– যে কন, এইডাতো ইলিশ মাছ, হাউমাছ অইব ক্যান?

সাহেব : ওকে।

মাছওয়ালা : স্যার, অরে চিনবেন না, এইডা মোর ভাতিজা।

রোগী ও ডাক্তার

রোগী ও ডাক্তারের মধ্যে কথোপকথন।

ডাক্তার : আপনার কি সমস্যা খুইলা বলেন?

রোগী : এই যে দেহেন, আমি দিন-দিন মোটা হয়ে যাচ্ছি। আমারে এমন ওষুধ দেন যাতে আমি দুই-তিন দিনের মধ্যেই শুকানো হতে শুরু করি।

ডাক্তার : আপনি আপামী এক মাস খাবেন সকালে একটি রুটি একটি ডিম; দুপুরে একটি রুটি, দুইটি ডিম, রাতে Nothing.

রোগী : আচ্ছা, ডাক্তারবাবু এগুলো কি খাওয়ার আগে খাব, না পরে খাব?

মোহাম্মদ আব্দুল হাসিব জেহাদ
কলেজ নম্বর : ১৪০২০
শ্রেণি ও শাখা : ষষ্ঠ-ক (প্রভাতি)

ধাঁধা

১. এমন কি জিনিস যা সবাইকে দেখে, অথচ নিজেকে সে দেখতে পায় না। উত্তর : চোখ।
২. এমন এক প্রাণী বের কর খুঁজে,সদা সে ঘুরে বেড়ায় চোখ নাহি বুঁজে। উত্তর : মাছি।
৩. নাকটি চেপে বসে, কানটি ধরে টানে, জগৎখানা ঘুরে বেড়ায় বলো তার মানে। উত্তর : চশমা।
৪. বাজে বাঁশি, বাঁশি নয়, শুঁড় আছে, হাতি নয়। দংশন করে সাপ নয়, বলো কোন প্রাণী হয়? উত্তর : মশা।
৫. এক কুড়ি বারো ভাই, এক সাথে রয়, সকল ভাইয়ের সবাই একই নামে রয়। উত্তর : দাঁত।
৬. তিন অক্ষরে নাম তার লবণ তাতে থাকে, মাঝের অক্ষর বাদ দিলে জমিতে লাগে। উত্তর : সাগর।

ফারহাম সাদিক
কলেজ নম্বর : ১২৬৫৬
শ্রেণি ও শাখা : নবম-ক (প্রভাতি)

ধাঁধা
মতিঝিলে একটা বাসা ভাড়া করে থাকতেন আরিফ, শাফিন, সাবিহা, নাদিয়া ও জেনিফা। শুক্রবার সকালে খুন হয়ে গেল জেনিফা। তদন্ত শুরু করল পুলিশ। বাসার চারজনকে সন্দেহ করল পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানাল–
আরিফ তখন খবরের কাগজ পড়ছিল।
শাফিন তখন পোষা পাখিকে খাবার দিচ্ছিল।
সাবিহা ডাক পিয়নের কাছ থেকে চিঠি নিচ্ছিল।
নাদিয়া রান্নায় ব্যস্ত ছিল।
উত্তর শুনে পুলিশের বুঝতে সমস্যা হয়নি কে খুনি। বলতে পারবে পুলিশ কাকে গ্রেফতার করেছিল?
উত্তর : সাবিহাকে। কারণ, শুক্রবারে ডাক পিয়ন আসে না। সে মিথ্যা বলেছিল।

শিহাব খন্দকার
কলেজ নম্বর : ৯৬৭০
শ্রেণি ও শাখা : নবম-ঙ (দিবা শাখা)

বিলিভ ইট অর নট!
* ক্যালিফোর্নিয়ার ডিন কারানজেস এক বিশেষ জিনগত কারণে অবিশ্রান্তভাবে দৌড়াতে পারেন। একবার তিনি না ঘুমিয়ে ৮০ ঘণ্টা ৪৪ মিনিটে ৩৫০ মাইল দৌড়েছেন।
* কীটনাশক দিয়ে মশা মারলে সেই মশা সব সময় ডান কাত হয়ে মারা পড়ে!
* ১৯০০ সালের শুরুর দিকে আইওয়ার মন্টেজুমার প্রতিটি নাগরিককে মুরগি পালতে হতো! যারা পালত না, তাদের শহর ছেড়ে যেতে বলা হতো!
* মি. বিনের অভিনেতা রোয়ান অ্যাটকিনসনের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি আছে!

মেহেদী হাসান মাহাদী
কলেজ নম্বর : ৯৭৩২
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-গ (দিবা)

ধাঁধা
* বাঘের মতো লাফ দেয়,
কুকুর হয়ে বসে,
পানির মধ্যে ছেড়ে দিলে
সোনা হয়ে ভাসে।
উত্তর : ব্যাঙ।

* বন থেকে বাহির হয় ওঝা
পাছায় লাঠি মাথায় বোঝা।
উত্তর : আনারস।

মো. শাহাদত হোসেন ভূঁইয়া
কলেজ নম্বর : ৯২৯৩
শ্রেণি ও শাখা : দ্বাদশ-ঘ (দিবা)

স্মরণীয় উক্তি
* যে ব্যক্তি পাপের মতো পুণ্যকেও গোপন রাখে সেই খাঁটি লোক – সুফি ইয়াকুব।
* দুঃখে মাথার চুল ছেঁড়া বোকামি, কেননা চুলহীন টেকো মাথার সাহায্যে দুঃখের লাঘব হয় না – সক্রেটিস
* অন্যেরা খাওয়ার জন্য বাঁচে আর আমি বাঁচার জন্য খাই – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
* গায়ের জোরে সব হতে পারে, কিন্তু গায়ের জোরে গুরু হওয়া যায় না – শেক্সপিয়ার
* কাপুরুষ তার মৃত্যুর আগেই অনেকবার মরে, নির্ভীক বীর মৃত্যুবরণ করে মাত্র একবার – সিসেরো

English Writings

Moments

Shaikh Sabik Kamal
College Roll : 7983
Class & Section : Six-A (Day)

The moments we create
Are the moments we share.
And the moments we share.
Are the moments we cherish.
The moments that we remember
Replace the moments of the past,
And are replaced by the present,
And the uncountable moments,
Of future, both near and far
The moments we create
Are the moments we want.
And the moments we want,
We need the moments to decide.
The decision of the past
The moments of the past
Are ones we learn from
For future and present, near and far
And the moments start now.

Near and Far

Everything we have
Near and Far,
Everything we wish for-
Seeing stars!
Everything at beginning,
Seems so far,
But near in the future
So near to us.
Our parents, our friends
Once near, once far
Our work and our trends
Both old and young,
Everything there is,
Near and Far-
Is what we've to achieve
So near, but far
Only if we know,
How to start things up
And end thing swiftly-
Both near, and far.

Bangladesh

Mahathir Mohammed Ratul
College Roll : 8026
Class & Section : Six-A (Day)

Bangladesh, in the long nine months
Were you with child,
Like a pregnant woman
You felt nauseated at times.
You couldn't eat well
You could not toil hard as before,
You carefully covered your
Distended belly
Lest someone might discover your condition.
Your ruthless companion West Pakistan
Often laughed at you and was
Sarcastic and acrimonious,
You were disgraced, insulted and persecuted.
You'd cry out in pregnancy-related pain
And wish you were dead,
But the expectation of seeing your upcoming child
You would endure all with a smile.
Your child is born today
You've forgotten
All the past suffering, disgrace and shame.
As you had carried your child for nine months
So have you so much care, affection and attachment for him!
Nurture, tend and protect
Your adorable son 'Independence.'
Today you are separated,
Your companion will no longer be able
To disgrace you.
Go forward with your head held high,
Your child will
Place you on a pedestal
Among the nations of the world.

Respect

Ahnaf Fuad Khan
College Roll : 8053
Class & Section : Six-A (Day)

Respect is what
Is not easy to get.
Respect is what
Is hard to have.
Respect is what
All want to get.
And when they don't get they try their best.
Respect is what
Is gained by struggle.
Respect is what
Is gained by work
When you have manners and discipline.
You get respect
When you don't have them you don't get respect.
So get on a war to have respect
Because respect is what
Is not easy to get.

I Want To Be That Human

Md. Ferdous Siddique
College Roll : 8640
Class & Section : Seven-B (Day)

I want to make success
My birth as human being,
I want to be blissful
For my honest and good mind.
I want to make success
In the world as human son,
By doing great work
I will make proud my nation.
I want to be that human
Who is born to help every creature,
I want to be that human
Who will have a polite nature.

The Very Easy

Md. Nishan
College Roll : 9805
Class & Section : Eleven-A (Morning)

Very easy to say 'no'
But- Very hard to say 'yes'
Very common to use the word 'sorry'
But- Very rare to forgive everybody
Very easy to spend money
But- Very hard to earn a penny
Very usual to hate other
But- Very wise to love each other.

It's Better Not to Care

Enamul
College Roll :9288
Class & Section : Twelve-C (Day)

It was yesterday
The house was just miles away
My bosom friend welcomed me
It was a tidy flat, I could see
My friend said to me, with pride
"It's a 48 lakh worth flat", smiling wide
I was surprised and happy
For my friend who was shining with glee.
He took me to his room;
I noticed very soon
That it had a lot of space
Lot of light, I saw
The source was the window.
I peeped out to see the scenes
I was awe struck by all means
There I could see a boy
Wearing a half pant without a toy
Throwing stones at a certain point
Going after some astray coins
Surrounded by a large group of houses
Ragged looking, small even for a mouse
I was looking, simply at a slum
And I felt myself turn
Back to the happy room,
So much comfortable for me
I don't need to peep out to see all the gloom,
It's better not to care or see.

My Tour to Bangkok

Amor Salhi Dahik
College Roll :14536
Class & Section : Four-A (Day)

Bangkok is the capital of Thailand. Bangkok welcomes more visitors than many other cities in the world. I had cherished a long dream to visit Bangkok. My dream came true when my father decided to go to Bangkok for my grandmother's treatment.

We boarded Thai Aeroplane on 16 January, 2017 and after a comfortable journey we reached at "Suvarnabhumi Airport" at 5:30 p.m. The airport was so nice and clean. We saw a big golden statue of Buddha at the airport. We saw here and there many photos and statues of Buddha. I understood why Thailand is called Buddha land. In Thailand crores of Buddhists live.

After reaching airport we went to a hotel by a microbus. Then we took dinner and went to sleep. Next morning we went out for roaming about the city. One interesting thing is that there was no dust or rubbish on roads. Here and there we saw many cafes. Ripe fruits are sold on roads. The fruits were so ripe. The shopkeepers were washing fruits well, cutting and selling them to the people.

We went to "Bamrungrad Hospital." It is an international hospital. It is very big and clean. There are so many shopping malls in Bangkok. We went to see the malls. I mostly enjoyed the sea world. I saw many fishes, octopus, sharks, etc. Those sea animals and fishes were kept in a water tank with thick glass walls. We also enjoyed riding the metro train. It took very little time to travel a long way. It was so speedy.

After spending 4 days in Bangkok we came home. I will never forget my tour to Bangkok.

A Memorable Day in My Life

Kowshique Islam (Feeadh)
College Roll :1540152
Class & Section : Five-A (Day)

In our day to day life we come by a lot of events but we don't remember all of them. Some days are so significant that we cannot but remember them. One such memorable day of my life is my first flight. I was preparing for my mid-term examination. My elder brother who lives in London of England for higher study sent three air tickets for visiting there for me, my mom and dad as a surprise. After sitting for exams, I got three weeks vacation. It was the month of April. I went to Biman Office by rickshaw with my parents. After waiting for some time, a bus of Bangladesh Biman took us to the airport. After checking in, the officer gave boarding cards with our seat numbers printed on them. I was waiting long in the lounge with other passengers. Then there was an announcement for the passengers to board the plane. I was full of excitement. My parents instructed me not to do any mischievious act during board-off. Then I walked up the stairs. An air hostess welcomed the passengers. Another man showed my seat. Luckily it was beside the window. In a short time, the pilot came to request us to follow some rules of board-off. We fastened our seat belts and the plane took off. I was scared at the deferring sound and the jerk. Gradually everything became right. Bangladesh Air Lines is faster than other airlines, still we had a long 12 hour-journey. The houses below looked like tiny toy houses. We were provided some snacks. The air-hostesses enquired us of our need and we were quite impressed by their charming voice and gentle behaviour. Although the journey was half-a-day it will have its long lasting effect on me. The journey was sound, safe and without any difficulties we reached the airport. We were warmly welcomed by my brother. It was really the most memorable day of my life that touched my deepest feelings of heart.

A Visit to India

Ahmed Shabab Hassan
College Roll :9698
Class & Section : Seven-A (Morning)

In 2014 I visited India. During this visit my parents and my elder brother were with me. It was a tour of 9 days. In this 9 day visit, first two we spent in Kolkata. Next five days we visited different places in Delhi, Jaipur and Agra. When we came back to Kolkata from Delhi, we spent two days seeing different charming places of Kolkata.

From Dhaka we at first went to Kolkata by bus. It took 7 hours to reach Kolkata. We stayed in D.K. International hotel. The next day, we visited the residence of famous poet Rabindranath Tagore which is popularly known as Jorasankor Thakur Bari. On the same day in the evening we went to the New Market for shopping. The third day, we started for Delhi from Howrah railway station by Rajdhani Express. It took 20 hours to reach Delhi. It was an excellent Journey.

In Delhi we visited Jantar Montar, Red Fort, Humayun's Tomb, Rashtrapati Bhaban, India Gate, Lodhi Garden and many other places. The next day was holy Eid-ul-Fitr. We performed our Eid prayer in Bangladesh High Commission in India. Another two days we visited Ajmer Sharif, Jaipur and Agra.

In Agra we enjoyed very much seeing one of the seven wonders of the world Taj Mahal. It was created by Emperor Shahjahan. It is a very beautiful as well as a historical place. We visited Agra Fort also. After that we went to Jaipur Which is known as Pink City. In Jaipur we visited Amber Fort, Jol Mahal, Jantar Mantar, Hawa Mahal etc. Then we went to Azmir Sharif. We came to Delhi on the same day. The next day early in the morning we started for Kolkata by Rajdhani Express from Delhi.

During the last two days of the 9 days Tour we spent in Kolkata visiting different places, such as : Victoria Memorial, Writer's Building, Eden Garden's Stadium and many other places. All of these places are very beautiful. The Eden Garden's stadium is one of the best stadiums in the world. After enjoying a memorable tour in India we returned to Dhaka. This tour was much enjoyable, charming and in a word, excellent. I will never forget this experience in my life.

History of Clock

Muntasir Mubeen
College Roll :13030
Class & Section : Eight-A (Morning)

For thousands of years devices have been used to measure and keep tract of time. The current system of time measurement dates back to approximately 2000 BC from the sumerians.

The ancient Egyptians divided the day into two spars of 12 hours each. They used large obelisks to track the movement of the sun. They also developed water clocks which were probably used in the prescient of Amun-Re, and also outside Egypt. They were employed frequently by 'Ancient Greeks' who were called 'Clepsydrae.' The 'Zhou' dynasty is believed to have used the outflow of water clock in the same time, devices which were introduced from Mesopotamia as early as 2000 BC.

Other ancient time keeping devices included candle clock from ancient China, Japan, England and Mesopotamia. The time stick used in India, Tibet, some parts of Europe also. The 'Hour glass' was similar to water clock was also used in many places. The 'Sundial' another early clock which relies on shadows to provide a good estimate of the hour on a sunny day but was not useful in cloudy day or night.

Earliest known clock with a water powered escapement mechanism, which powered escapement mechanism, which transformed rotational energy into intermittent, nation dates back to the 3rd Century in ancient Greece. The Chinese engineers later invented clocks incorporating mercury powered escapement mechanism in the 10th century. Followed by, the Iranian engineers invented water clocks by gears and weights in the 11th century.

The first mechanical clock, employing the verge of escapement mechanism with a faliot or balance wheel timekeeper were invented in Europe in 14th century.

The main spring was invented in the 15th century until the pendulum clock came in the 1656. Portable clocks were built during the 17th century. The time from it because very accurate until the balance spring was added to the balance wheel in the mid 17 century.

The pendulum clock remained the most accurate timekeepers until 1930, when Quartz Oscillators were invented. Followed by the Atomic clock after the world war 2.

Although initially limited to the laboratories the development of microelectronic in 1960s made quartz look moor compact and cheap to produce by 1980s but world's dominant time keeping technology in both clock and wristwatches.

Atomic clocks are far more accurate than any previous time keeping devices and are used to calibrate other clocks to calculate International Atomic time, a standardized civil system Co-ordinate universal time, is based on Atomic clock.

Source: "https://en.m.wikipedia.org"

Lunar Eclipse

Rakib Ahmed Joy
College Roll : 8772
Class & Section : Ten-F (Day)

There was a kingdom somewhere in India. The king of that kingdom was very barbaric and cruel. He used to oppress the people of that kingdom a lot. So, two heroic adult men of that kingdom started to arrange an army to revolt against the King. The name of these two heroic soldiers were Amit and Pramit and the king's name was 'kans'. The two heroic soldiers, after making an army, fought the king and killed him. So, the age of oppression came to an end. The citizens of that kingdom decided to select a king from those two heroic fighters, Amit and Pramit. Amit and Pramit were very good friends. They could even sacrifice their life for each other. As they liberated the kingdom, confusion arose who the upcoming king would be. One night Pramit was standing in the balcony enjoying the moon light of the night. Then Amit came and proposed Pramit to be the king. Pramit replied in the negative and told Amit to be the king and he would be the minister. Amit also refused to be king. Among them a quarrel was about to rise on who the king would be. Amit said, "I have an idea." Today is lunar eclipse. So, one of us will be the king from this lunar eclipse to next coming lunar eclipse. When the next lunar eclipse arrives, he will no more be king. Then another one will be the king." Pramit liked the idea. So, he said, "Ok." Amit further said, "As you have killed the king, you will be the king first and after you I will be the king." Pramit agreed to the proposal. So, from then on he was the king of that kingdom. After few months a battle was to be launched against Pramit's kingdom and Urissa's king Hatem's kingdom. So, Amit as a minister was taking good care of everything. The day of battle came and Pramit fought Hatem and killed him and captured his daughter 'Ishika' and took her to his kingdom. Amit, seeing the princess captured, felt mercy for her. He proposed king Pramit to release her and let her go. Pramit denied and told him that he would marry her after some months. Until then he ordered him to teach her their language. As Pramit was king and Amit was his minister, so he had to follow his order. So, Amit introduced himself to Ishika and slowly started to teach her their language. Ishika was a very stubborn princess. She did not want to stay in prison and she hated the king Pramit heartily.Pramit killed her parents and captured her. But Amit told her to marry the king which was an order from the king. Ishika rejected that proposal. A friendship bond was created between Ishika and Amit. They were more than friends. After 2 months, coming back from tour, Pramit ordered the minister to arrange the marriage ceremony between him and Ishika. But Ishika hated him very much. So, when Amit proposed her for that she said, "I would rather die than marry that barbarous king. I will commit suicide on the night if I am married with Pramit." Amit tried to convince her. But all went in vain. At last the day came when the king would be married to Ishika. The kingdom took a festival mood. But two persons were very sad. One was Amit and another was Ishika. Ishika did not want to marry that king and Amit knew if she was married with the king she would commit suicide but he was helpless. It was the duty of the minister to follow king's order; so he became very tensed. When the night arose, Amit made Ishika ready and took her to the pandel and the king was waiting there to start the ceremony. Ishika took two poisonous flowers with her so that she could commit suicide. The marriage process started. The pandit started reciting mantras. When the king was about to pour vermilon (shidur) in the Princess Ishika's head, suddenly, Amit

shouted, "Minister stand up." He again said, "I order you to stand up." King Pramit was amazed at his such behaviors and said, "What has happened to you"? Then and there a sudden shake came to king Pramit's body and mind. With amazement and fear he looked in the sky. "Oh my God!" It's the lunar eclipse and Pramit was no more the king. He remembered that previous promise between him and his friend Amit about who the king would be and their ruling time. His ruling time ended. Amit was now the king and Pramit was the minister. He laughed highly, Ha! Ha! Ha!..... Controlling his laughing Pramit said, "Yes, Your honour". So, Amit was the king from then on. And thus Amit and Ishika got married that night. Pramit was no more the king and Amit was the new king. So, Amit started ruling the kingdom. And in every lunar eclipse the king was changed.

Mystery within Mystery

Misbahul Islam Saad
College Roll : 9968
Class & Section : Eleven-D (Day)

Two children were left in the charge of a stern governess as their parents left for Singapore for a treatment. The master of the house was a patient of epilepsy and he was suffering a lot from it. He was so annoyed and got bored with it as it had been attacking him regularly for last few days. So he decided to put an end mark to the disgusting disease 'epilepsy'. For this reason, he left for Singapore with his wife.

As it was very difficult and tough to go with their two children, the master and the mistress had decided to leave their children under the responsibility of a governess who was hired for household chores. Relying on her sense of responsibility, they left for Mount Elizabeth Hospital, Singapore for a month. The master and the mistress were staying there relaxed and free from tension. But there was a total different condition prevailing at home. The governess who was appointed for looking after the children was very stern and cruel. She always wanted the children to obey her strictly and to pay full tribute to her. But the two children did not do so. They decided to enjoy the time comfortably. They were not attentive to their studies and overall routine. They were doing as and what they wished. It was not liked by the governess. She started to behave very roughly but the boy's didn't pay any heed even at that time.

- "Hey, bloody stupid boys! Come here quickly and have dinner now," ordered the governess.
- "No, we will see the 'puzzle making' from 10:30 pm. It is going to start. So we are not taking our dinner right now. Wait and leave," the elder one loudly shouted.
- "I will beat you if you two do not attend me," she replied.
- "We don't fear you. Ha ha ha."
- "You must be joking," replied both the elder one and the junior one.

The situation continued for a few days. The governess and two children sometimes quarreled as they did not like each other. They became opponent to the other. This situation continued but the master and the mistress were not very much aware of it as nobody talked about their problems to them. They used to talk to her and two children but didn't listen up complaints against each other.

Time and moments passed by but the situation did not change. The stern lady got more aggressive and the two children also. One day the lady beat them for not obeying her. They got involved in mad abusing to each other. Even the rough words of both sides were also heard by the neighbors. But they did not come forward to solve it at all.

One day a strange thing took place. Nobody was ready for that. The junior child started to vomit suddenly. The lady did not find a way what to do at that stage. She made contact with the relatives of them and they called upon the doctor immediately. But it was very late. After some time, the doctor declared him dead. Everyone stood astonished hearing this. He was just vomiting and them died! Alas! It was really a heartrending scene at the house. The master and the mistress were speechless at the news of the death of their beloved child.

The situation went by and the master and the mistress returned from Singapore. The dead body was taken by the police and the police arrested the governess of the house. After two days, the post mortem report was revealed. It was really shocking. The report said that the child was not dead, he was killed. He was killed in the effect of Kalium Carbide (potassium Carbide-a chemical substance which is generally used to ripen fruit artificially). Excessive usage of this precarious chemical killed the boy. The governess was shocked after the death. She was not even in the situation of talking. She was really mourning for him.

As it was an interesting case, the whole media such as printing media, electronic media attracted and highlighted the matter very deeply. All the neighbours and the elder child put their suspect on the lady for the death. It was like a bolt from the blue for the woman. She denied all the relevance of her in this death. But all her crying and talking went in vain. She was arrested as the master had filed a murder case against her.

Then the lady was taken under remand in police custody for 8 days. She repeatedly declared herself as innocent in this case. But the police insisted her on telling about the motive of murder the child; for property, for quarrelling, for taking revenge against the mistress on anything else.

But she was firm in her decision and talking. So all the attempts went in vain. When the police failed to reveal the matter, the honorable court displaced them from the investigation with CID (Crime Investigation Department).

CID took the case and started to investigate. When they investigated it, a sudden news came from the governess that a friend of the master had come to their house at the previous night of death with a bucket of fruit. Only the unfortunate child took the fruit in the morning. Nobody else took them.

After investigating a lot, CID declared everything in a press briefing before media. The head of media wing of CID revealed all that the master offered his friend to go to his home at night with a bucket of fruits. The fruits were containing potassium Carbide. The friend agreed to this proposal for a large amount of money. The master wanted to kill anyone of his house as he wanted to make a partner of his business the scape-goat of the murder. He tried a lot after coming from abroad. But all his efforts went in vain. CID revealed the mystery. But it was not just a mystery. It was a mystery within a mystery! Really, wasn't it?

Bangladesh & World Science
Bangladesh History

Kazi Tasnimul Amin
College Roll : 14519
Class & Section : Four-A (Morning)

1. When did Alexander attack India? Ans. In the 273 B.C.
2. When did the Aryans start coming to Bengali? Ans. Around 100 A.D.
3. Which dynasty ruled Bengal for the longest period of time?
   Ans. Pala dynasty. The dynasty ruled almost 400 years starting from 756 A.D.
4. When did the Muslims come to Bengal First? Ans. In 712 A.D.
5. When was Bengal brought under Mughal Empire? Ans. In 1576 A.D.
6. Who were Baro Bhuiyan?
   Ans. During the rule of Mughal Emperor Akbar, 12 Powerful Zaminders ruled their lands independently. They are called Baro Bhuiyans.
7. Who was the most prominent among Baro Bhuiyans? Ans. Isa khan of Soonargoan.
8. When did the English come to Bengal first? Ans. 22 September, 1599 A.D.
9. Who was the last independent ruler of Bengal?
   Ans. Nawad Sirajuddaula. He was the grandson of Alibordi khan.
10. In which battle was Nawab Sirajuddula defeated by the English?
   Ans. In the battle of Plessey, 15 November of 1757 A.D.
11. When was the University of Dhaka stablished? Ans. 1921 A.D.

C. Science

1. What is the distance of moon from the earth? Ans. 3,82,400 kilometers.
2. What is the average distance of the sun from the earth? Ans. About 15 Kilometers.
3. How long does it take for the sunlight to come to the earth? Ans. 8 minutes 18 seconds.
4. What is the famous comet of the solar system? Ans. Hally's Comet.
5. What is the name of the largest planet of the solar system? Ans. Jupeter.
6. What is the smallest planet of the solar system? Ans. Mercury.
7. Which planet is nearest to the earth? Ans. Mars.
8. Who discovered the fact that earth moves round the sun? Ans. Italian Scientist Galieleo
9. Who discovered the fact that earth is round? Ans. Greek Schoolar Pythagoras.

Mahathir Mohammed Ratul
College Roll : 8026
Class & Section : Six-A (Day)

1. Which is a ditch of Bay of Bengal? Ans. Swatch of no ground
2. What is the underworld of Dhaka? Ans. The Pacific Ocean of Chili.
3. When did Bangladesh India boundary bill signed? Ans. On 16 May, 1974
4. What is the economic sea boundary of Bangladesh? Ans. 200 nautical mile on 367 k.m.
5. How many Sitmahal were in India of Bangladesh? Ans. 51
6. How many Sitmahals of India were in Bangladesh? Ans. 111
7. What is SPARRSO? Ans. Space Research and Remote Sensing Organization.
8. What is Green peace? Ans. International Environment Movement based on Nederland.
9. Why is Green house effect harful? Ans. For CFC gas.
10. What is the meaning of Ayla? Ans. Dolphin.

Jokes

Irfan Sarwar
College Roll : 8050
Class & Section : Six-A (Day)

1. Two kids were arguing when the teacher entered.

Teacher : Why are you arguing?
Kid : We found 100 tk and decided to give it to whoever tells the finest lie.
Teacher : Shame on you. When I was your age I didn't even know what a lie was.
The kid gave money to the teacher.

2. A customer ordered a cup of coffee in a restaurant! The waiter served the coffee. The customer found a fly in the coffee. He called the waiter.

Customer : How do I drink this coffee!
Waiter : Don't you know how to drink a coffee?
Customer : Waiter, see, there is a fly in my coffee.
Waiter : Oh yes Sir, you are right! There is a fly in your coffee.
Customer : Waiter, I said, there is a fly in MY coffee (He stressed the word MY)
Waiter : Oh don't worry Sir, the fly won't drink much!
Customer : Waiter, it is swimming in my coffee.
Waiter : Sir, do you want me to get a lifeguard for the fly?
Customer : The fly is dead. It's irritating!
Waiter : I guess, it doesn't know how to swim proprely.
Customer : How do I drink this coffee?
Waiter : Don't you know how to drink? I will teach you!
He drank the coffee! And said, this is how you should drink a coffee.

সোয়াচ্ছাহ্য হাওলাদার
কলেজ নম্বর : ১৬১৩৪
শ্রেণি ও শাখা : তৃতীয়-ক (প্রভাতি)

রাশেদুল ইসলাম ইয়ন
কলেজ নম্বর : ১৫৩০৩৬৯
শ্রেণি ও শাখা : ষষ্ঠ-ক (প্রভাতি)

সৌম্য সাহা
কলেজ নম্বর : ৮৬৯১
শ্রেণি ও শাখা : সপ্তম-খ (দিবা)

জাওয়াদ মোহাম্মদ নাহিন
কলেজ নম্বর : ১৪০১০
শ্রেণি ও শাখা : সপ্তম-ক (প্রভাতি)

জয় পাল
কলেজ নম্বর : ৭৫৪০
শ্রেণি ও শাখা : সপ্তম-খ (দিবা)

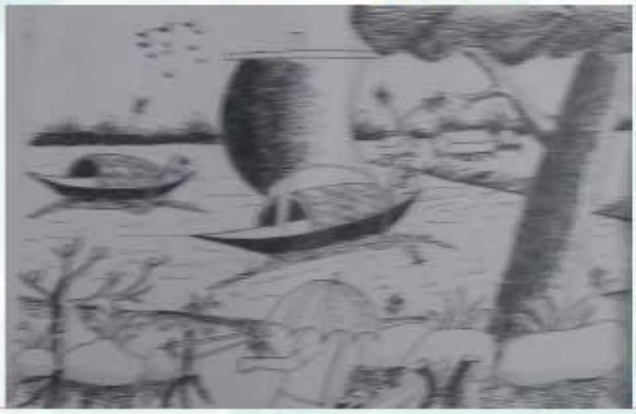

সৌম্য সাহা
কলেজ নম্বর : ৮৬৯১
শ্রেণি ও শাখা : সপ্তম-খ (দিবা)

সৌম্য সাহা
কলেজ নম্বর : ৮৬৯১
শ্রেণি ও শাখা : সপ্তম-খ (দিবা)

রাইসুল ইসলাম
কলেজ নম্বর : ১৩৩৮৭
শ্রেণি ও শাখা : অষ্টম-গ (প্রভাতি)

শেখ শিহাব শারার মনির
কলেজ নম্বর : ৬৯০৬
শ্রেণি ও শাখা : অষ্টম-গ (দিবা)

আজওয়াদ আখলাক
কলেজ নম্বর : ৭১১৫
শ্রেণি ও শাখা : অষ্টম-খ (দিবা)

নাবিল ফারুক রাফিন
কলেজ নম্বর : ৬৫০৩
শ্রেণি ও শাখা : নবম-গ (দিবা)

আল-শাহরিয়ার
কলেজ নম্বর : ১৫৫৩০
শ্রেণি ও শাখা : নবম-ঘ (প্রভাতি)

রাকিব আহমেদ জয়
কলেজ নম্বর : ৮৭৭২
শ্রেণি ও শাখা : দশম-চ (দিবা)

রিদওয়ান সিদ্দিক
কলেজ নম্বর : ১০০২৮
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-ঘ (দিবা)

গোলাম রাব্বি
কলেজ নম্বর : ১৫৭৩৫
শ্রেণি ও শাখা : একাদশ-ক (প্রভাতি)

শ্রেণি শিক্ষকসহ তৃতীয়-ক (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ তৃতীয়-খ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ তৃতীয়-গ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ তৃতীয়-ক (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ তৃতীয়-খ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ তৃতীয়-গ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ চতুর্থ-ক (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ চতুর্থ-খ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ চতুর্থ-গ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ চতুর্থ-ক (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ চতুর্থ-খ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ চতুর্থ-গ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ পঞ্চম-ক (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ পঞ্চম-খ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ পঞ্চম-গ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ পঞ্চম-ক (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ পঞ্চম-খ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ পঞ্চম-গ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ ষষ্ঠ-ক (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ ষষ্ঠ-খ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ ষষ্ঠ-গ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ ষষ্ঠ-ঘ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ ষষ্ঠ-ক (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ ষষ্ঠ-খ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ ষষ্ঠ-গ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ ষষ্ঠ-ঘ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ সপ্তম-ক (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ সপ্তম-খ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ সপ্তম-গ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ সপ্তম-ঘ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ সপ্তম-ক (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ সপ্তম-খ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ সপ্তম-গ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ সপ্তম-ঘ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ অষ্টম-ক (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ অষ্টম-খ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ অষ্টম-গ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ অষ্টম-ক (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ অষ্টম-খ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ অষ্টম-গ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ নমব-ক (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ নবম-গ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ নবম-ঘ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ নবম-ঙ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ নবম-চ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ নবম-খ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ নবম-গ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ নবম-ঘ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ নবম-ঙ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ নবম-চ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দশম-ক (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দশম-গ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দশম-ঘ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দশম-ঙ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দশম-চ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দশম-খ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দশম-প (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দশম-ঘ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দশম-ঙ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দশম-চ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ একাদশ-ক (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ একাদশ-খ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ একাদশ-গ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ একাদশ-ঘ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ একাদশ-ঙ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ একাদশ-চ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ একাদশ-ছ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ একাদশ-ক (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ একাদশ-খ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ একাদশ-গ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ একাদশ-ঘ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ একাদশ-ঙ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ একাদশ-চ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ একাদশ-ছ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দ্বাদশ-ক (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দ্বাদশ-খ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দ্বাদশ-প (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দ্বাদশ-ম (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দ্বাদশ-ঙ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দ্বাদশ-চ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দ্বাদশ-ছ (প্রভাতি) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দ্বাদশ-ক (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দ্বাদশ-খ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দ্বাদশ-গ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দ্বাদশ-ঘ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দ্বাদশ-ঙ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দ্বাদশ-চ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি শিক্ষকসহ দ্বাদশ-ছ (দিবা) শিক্ষার্থীবৃন্দ

স্মৃতির এ্যালবাম

পাঠ্যপুস্তক উৎসব ২০১৭-এ নতুন বই হাতে উল্লসিত শিক্ষার্থীরা

পাঠ্যপুস্তক দিবস ২০১৭-তে উপাধ্যক্ষ মহোদয়গণ

মাননীয় অধ্যক্ষ কর্তৃক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৭ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৭ তে মাননীয় শিক্ষা সচিব ও অধ্যক্ষ মহোদয়ের সালাম গ্রহণ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৭ তে শিক্ষার্থীদের মার্চপাস্ট

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৭ তে শিক্ষার্থীদের মনোরম ডিসপ্লে

মাননীয় শিক্ষা সচিব ও অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট থেকে ট্রফি গ্রহণ

ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন সহযোগী অধ্যাপক জনাব শহীদ উল্যাহ

অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের ক্রেস্ট প্রদান

স্থির চিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন অধ্যক্ষসহ অতিথিবৃন্দ

অধ্যক্ষ মহোদয়ের মনোমুগ্ধকর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা পরিদর্শন

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০১৭ তে স্কুলের ছাত্রদের অংশগ্রহণকারী ১টি দল

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি ও অধ্যক্ষ-মহোদয়ের নিকট থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ

অমর একুশের ভোরে ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রভাতফেরি

জাতীয় শিশু দিবসে স্কুলের খুদে শিক্ষার্থীদের গান পরিবেশন

স্বাধীনতা দিবসে শিক্ষার্থীর বক্তব্য প্রদান

স্বাধীনতা দিবস-২০১৭ তে শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত পরিবেশনা

পহেলা বৈশাখে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা করছে আমন্ত্রিত দল

পহেলা বৈশাখে শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

পহেলা বৈশাখের লাঠি খেলা উপভোগ করছেন অতিথিবৃন্দ

অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা

এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল উদযাপন

বিতর্ক উৎসব-২০১৭ তে বিজয়ীদের সাথে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও অধ্যক্ষ মহোদয়

৪র্থ জাতীয় ভাষা উৎসবে বিজয়ীদের সাথে অধ্যক্ষ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

নবীন বরণ অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরবেশনা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০১৭ উপলক্ষে অধ্যক্ষসহ অন্যান্যদের র‌্যালী

বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০১৭ উপলক্ষে অধ্যক্ষ মহোদয়ের বৃক্ষ রোপণ

শিক্ষাসফর ২০১৭-তে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা

বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে শিক্ষাসফর ২০১৭-তে ছাত্রদের একাংশ

১১তম জাতীয় বিজ্ঞান মেলায় প্রধান অতিথি, অধ্যক্ষসহ আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

বিজ্ঞান মেলায় বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখছেন অতিথিবৃন্দ

১১তম জাতীয় বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

বেলুন উড়িয়ে ঈদ পুনর্মিলনী উদযাপন

ঈদ পুনর্মিলনী-২০১৭ তে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

ঈদ পুনর্মিলনী ২০১৭-তে অংশগ্রহণকারী শিশুদের বিস্কুট দৌড় প্রতিযোগিতা

জাতীয় শোক দিবস-২০১৭ তে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অনুভূতি ব্যক্ত করছেন একজন শিক্ষার্থী

জাতীয় শোক দিবস-২০১৭ তে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে বই প্রদান

সাপ্তাহিক সমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছেন অধ্যাক্ষ মহোদয়

বিজয় দিবস-২০১৭ অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করছে একজন ক্ষুদে শিক্ষার্থী

ডিআরএমসি মেডিকেল সেন্টারের আধুনিকায়ন অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ মহোদয়

ক্লাস পার্টিতে অধ্যক্ষ মহোদয়কে কেক খাওয়াচ্ছে শিক্ষার্থীরা

ভূগোল ল্যাবে অনুশীলনরত শিক্ষার্থীরা

কম্পিউটার ল্যাবে অনুশীলনে ব্যস্ত শিক্ষার্থীরা

জীববিজ্ঞান ল্যাবে অনুশীলনরত শিক্ষার্থীরা

রসায়ন ল্যাবে অনুশীলনরত শিক্ষার্থীরা

পদার্থবিজ্ঞান ল্যাবে অনুশীলনরত শিক্ষার্থীরা

লাইব্রেরিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা

চলছে ক্রীড়া অনুষ্ঠানে মোড়গ লড়াই খেলা

DRMC- ফুটবল দল

বিদায়ি অধ্যক্ষকে স্মারক প্রদান

বিদায়ি উপাধ্যক্ষের সম্মানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ড. সৈয়দা খালেদা জাহানকে বিদায় স্মারক প্রদান

হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মশিউর রহমান-এর বিদায় সংবর্ধনা

নিজ বিদায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

অধ্যক্ষ ব্রি. জে. মোঃ আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে বিদায় স্মারক প্রদান

বিজয় দিবস ২০১৭-তে নবাগত অধ্যক্ষ মহোদয়কে ফুল দিয়ে বরণ

মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন অধ্যক্ষবৃন্দ ও অতিথিবৃন্দ

কলেজের নির্বাচিত শিল্পীদের গানে মুখরিত বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান

মহান বিজয় দিবসে ক্ষুদে শিল্পীর সঙ্গীত পরিবেশনা

নৃত্য পরিবেশ করছে কলেজের একজন ক্ষুদে শিক্ষার্থী

পুরস্কার প্রাপ্ত ছাত্রদের সনদপত্র প্রদান করছে মাননীয় অধ্যক্ষ

পুরস্কার প্রাপ্ত ছাত্র, শিল্পী ও কলাকৌশলীদের সাথে অধ্যক্ষবৃন্দ ও উপাধ্যক্ষমহোদয়

মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ মহোদয়